THE CREED OF ISLAM

Written by: Abul Hashim

Translated by: M Ataur Rahman Pir

দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম

আবুল হাশিম

ছায়ালাপ

অনুবাদ

এম আতাউর রহমান পীর

দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম
অর
দ্য রেভ্যালুশনারি ক্যারিক্ট্যার অভ্ কলেমা

আল- ামা আবুল হাশিম

অনুবাদ
প্রফেসর মেজর এম আতাউর রহমান পীর

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন ১৪১২ : ফেব্র ুয়ারি ২০০৬

স্বত্ব
নাবিলা মাহজাবিন রিয়া

প্রকাশক
রানা মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান পীর ও
র মেল মোহাম্মদ সাইফুর রহমান পীর
ছায়ালাপ
সিলেট মোবাইল পাঠাগার
দরগা মহল- া, সিলেট
ফোন: ৮১২০৬৪, মোবাইল: ০১৭১৯২৩৩৭৩

মুদ্রণ
মোহাম্মদীয়া অফসেট প্রিন্টার্স
দরগা মহল- া, সিলেট।

অক্ষরবিন্যাস
শাহার ল আলম

প্রচ্ছদ
শাহ্ আলম

পরিবেশনায়
বন্ধু লাইব্রেরি এন্ড পাবলিকেশন্স
রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট

মূল্য
২০০ টাকা

ISBN 984-32-3085-X

The Creed of Islam or The Revolutionary Character of Kalima, written by Abul Hashim, translated by Prof. Major M. Ataur Rahman Pir BTFO, Principal, Madan Mohan College, Sylhet. Published by Chayalap, Sylhet Mobile Pathagar, Dargah Mohalla, Sylhet, Price: Taka 200.00

উৎসর্গ

প্রপিতামহ সুফি সাধক মরমি কবি (পীর) শাহ আছদ আলী
পিতামহ আব্দুর রহমান পীর
পিতা আব্দুল মান্নান পীর
মাতা আইয়ূবুন্নেছা খাতুন
এবং
পিতৃব্য আব্দুস সোবহান পীর
স্মরণে

অনুবাদকের কথা

ইসলামি চিন্ড়াবিদ, কথাশিল্পী শাহেদ আলী (১৯২৫-২০০১ খ্রি.) বলেছেন: 'ইসলাম একটি তথাকথিত ধর্ম নয়, একটা চিরন্ড়ন ও সামগ্রিক আন্দোলন— যার লক্ষ্য ব্যক্তি-মানস ও সমাজ-মানুষের দেহ, মন ও আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশ। শোষণ, জুলুম ও বৈষম্য থেকে মুক্ত একটি মানবসমাজ সৃষ্টি রাব্বুল আলামিনের পালননীতির উদ্দেশ্য; সমগ্র প্রকৃতিতে যেমন এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে তেমনই মহাগ্রন্থ আল কুরআনে রয়েছে তার বিশে- ষণ। আল- ামা আবুল হাশিম রচিত **দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম** কলেমার বৈপ- বিক তাৎপর্যকে একটা সার্বিক আন্দোলন ও বিপ- বের হাতিয়াররূপে উদ্ঘাটিত করেছে মানবজাতির জন্যে।'

একদিন যে কলেমা সমগ্র বিশ্বে স্বল্পকালের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের মন-মগজ ও বিবেকে বিপ- ব সৃষ্টি করেছিলো সেই কলেমার মহান শিক্ষা থেকে বিচ্যুত মুসলমানেরা আজ দুর্দশাগ্রস্ড়—এ অকাট্য সত্যটি লেখক বুঝাতে চেষ্টা করেছেন **দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম** গ্রন্থে। সাংস্কৃতিক সংগঠন তমদ্দুন মজলিশের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কল্যাণে বইটি ছাত্রাবস্থায় পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো। তখন কতটুকু বোধগম্য হয়েছিলো বা প্রেরণা সঞ্চার করেছিলো জানি না। তবে এর আলোড়ন এখনও অনুভব করি। সেই জারিত বোধ আর প্রিয়জনদের প্রেরণাই আমাকে গ্রন্থের অনুবাদে ব্রতী করে। অধ্যক্ষ মাসউদ খান, কবি আবিদ ফায়সাল, গ্রন্থাগারিক আবু তাহের এবং অ্যাডভোকেট এম শহীদুল ইসলাম শহীদ স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ না দিলে এই গ্রন্থের অনুবাদ হয়তো বিলম্ব হতো। ইংরেজি ভাষায় স্বল্প জ্ঞান নিয়েই অনুবাদে হাত দেই। কিন্ড়ু যখন জানতে পারি, অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশে মূল লেখকের অনুমতি প্রয়োজন, তখন উৎসাহে ভাটা পড়ে। কারণ আল- ামা আবুল হাশিম এর উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে আমার কোনো যোগসূত্র নেই, তাই সম্মতি আদায় করা হয়তো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে পুস্ড়ক ব্যবসায়ী বন্ধুবর মাহবুবুল আলম মিলন-এর সঙ্গে কথা হলে তার মাধ্যমে কপিরাইট আইন সম্পর্কে অবহিত হই এবং আইনি জটিলতা নেই—জেনে পুনরায় অনুবাদ শুর" করি। পরবর্তীকালে সহকর্মী অধ্যাপক নীলকান্ড় দে, অধ্যাপক গোলাম কাদির মোহাম্মদ আলমগীর, অধ্যাপক সুরেশ রঞ্জন বসাক, মি. হেমন্ড় লাল রায়, কলেজের অফিস সহকারী বিভাস রায়, সমীরন দাস ও কম্পিউটার অপারেটর শাহার"ল আলম এবং আমার সহধর্মিণী ফিরোজা আক্তার ও

পুত্রবধূ ডা. বিলকিস সুলতানা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আগ্রহকে উসকে দেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

ইতঃপূর্বে এ গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী লেখকপুত্র বদর"দ্দীন উমর এবং সিলেটের কৃতীসন্ড়ান শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী (১৯১১-১৯৯৪ খ্রি.)। তাঁদের ভাষার নৈপুণ্য ও প্রাঞ্জল ব্যবহার অতুলনীয়। এক্ষেত্রে এ অনুবাদকের দীনতা পাঠকমাত্র অনুভব করবেন। অনুবাদগ্রন্থ দু'টি আমাকে অপরিসীম সহায়তা করেছে। আমি অনুবাদকদ্বয়ের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞ। একই সঙ্গে চৌধুরী-র র"হের মাগফেরাত কামনা করছি।

আল- ামা আবুল হাশিমের **দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম** গ্রন্থটি ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকাসহ এশিয়া মহাদেশের অগণিত অনুসন্ধিৎসু গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় গ্রন্থটির সমাদর গোটা বিশ্বব্যাপী। কিন্ড়ু দীর্ঘদিন থেকে অভূতপূর্ব এ গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে না। অথচ এর চাহিদা পূরণ এবং চিন্ড়াশীল মানুষের মননে ইসলামের মূল আদর্শ, কলেমার বৈপ- বিক ব্যাখ্যা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের। এই নৈতিক দায়িত্বটি পালন করতে গরীয়ান-মহীয়ান 'আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা' এ অনুবাদককে সাহস ও শক্তি প্রদান করেছেন, এজন্য শোকরিয়া আদায় করছি। আমার বিশ্বাস কলেমার সঠিক শিক্ষাকে উপলব্ধি করতে গ্রন্থটি সহায়তা করবে। ইসলামের পুনর্জাগরণে কলেমার বৈপ- বিক দর্শনে পুনরায় উদ্ভাসিত হয়ে মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার তৌফিক আল- াহপাক সকলকে দান কর"ন।

এম আতাউর রহমান পীর
অধ্যক্ষ
মদন মোহন কলেজ, সিলেট

১৫ ফেব্র"য়ারি, ২০০৬

সূচি

মুখবন্ধ ০৯
অবতরণিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা মানবীয় ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা ১৭
বুদ্ধি ও স্বজ্ঞা ২০
অদৃশ্যে বিশ্বাস ২১
শূন্যতাবাদ ২৩
ধর্মের ধারণা ২৫
ফিতরাত ও কুদরাত ২৯
ইসলাম ৩৩
ইসলামের উৎস ৩৫
আল কুরআন ৩৯
কুরআন অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ৪৪
কলেমা ৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
আধ্যাত্মিক বিপ- ব উপাস্যের সন্ধানে ৫১
দেবদেবীর অস্বীকৃতি ৫২
আল- াহ ও ধর্ম অস্বীকার ৫৪
নিষিদ্ধ ফল ৫৫
মানুষের স্বরূপ ব্যাখ্যায় কলেমা ৫৭
আল- াহ'র গুণাবলী ৫৯
আধ্যাত্মিক বিপ- ব ৬০

তৃতীয় অধ্যায়
নৈতিক বিপ- ব নীতিতত্ত্ব ৬২
মানবপ্রণীত আইন ও জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি ৬৪
বহুদেবত্বের নীতিতত্ত্ব ৬৬
কলেমার প্রভাব ৬৭

চতুর্থ অধ্যায়
বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ- ব বুদ্ধির মুক্তি ৬৯
জ্ঞানপিপাসা ৭১
প্রাচ্যের অন্ধকারাচ্ছন্নতা ৭৩
যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত ৭৪
শিক্ষার দর্শন ৭৫

পঞ্চম অধ্যায়
সমাজ বিপ- ব
তমসার যুগ ৭৮
কলেমার শিক্ষা ৮০
শ্রেণিহীন সমাজ ৮১
শ্রেণিসংগ্রাম ৮৩
ক্ষুধা ও যৌন প্রবৃত্তি ৮৫

ষষ্ঠ অধ্যায়
রাজনৈতিক বিপ- ব
জাতি ও জাতীয়তা ৮৭
সার্বভৌমত্ব ৮৯
গণতন্ত্র ৯৩
খিলাফত ৯৬
অরাজকতা ৯৯
যুদ্ধ ও শান্ড়ি ১০৪

সপ্তম অধ্যায়
অর্থনৈতিক বিপ- ব
বস্ড়ুগত বা জড় সম্পদের মালিকানা ১০৭
ব্যক্তিগত দখলদারি ১১১
সম্পদের মওজুদদারি ১১২
মূলধন, সুদ ও মুনাফা ১১৪
জাকাত ও উত্তরাধিকার আইন ১১৭

অষ্টম অধ্যায়
সাংস্কৃতিক বিপ- ব
কলেমার সংস্কৃতি ১২০
আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি ১২০
নৈতিক সংস্কৃতি ১২২
বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি ১২৩
সামাজিক সংস্কৃতি ১২৪
রাজনৈতিক সংস্কৃতি ১২৫
অর্থনৈতিক সংস্কৃতি ১২৬
পূর্ণ মানব ১২৭

মুখবন্ধ

'দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম' এর লেখক বিশিষ্ট ইসলামি চিন্ড়াবিদ আবুল হাশিম চিন্ড়া ও কর্মে আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। আমি বইটির আদ্যোপান্ড় পড়েছি এবং অত্যন্ড় যত্ন ও মনোযোগ সহকারে প্রতিটি শব্দের মর্মার্থ অনুধাবন করেছি। আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছি যে, মৌলিক সৃষ্টির জগতে এই বইখানা একটা নতুন তারকাস্বরূপ, যে তারকা শত শত বছরে একবার আবির্ভূত হয়ে জ্ঞান ও মৌলিক সৃষ্টির জগতে বিপ- ব সৃষ্টি করে। বইটির সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে তার দর্শনের মধ্যে, যা আমার লেখা ছাড়া এখনও অনেক বুদ্ধিজীবীর লেখনির বাইরে রয়েছে বলে আমার ধারণা। এ বইয়ে বর্ণিত দর্শন হচ্ছে 'রাব্বানিয়ত'[১] এর দর্শন, যা জ্ঞানচর্চার এক দুর্লভ ফল এবং যার মধ্যে আল কুরআনের শিক্ষার সারমর্ম ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

যদিও 'ধর্মের ধারণা' শীর্ষক প্রবন্ধটি ছাড়া বইয়ের কোথাও 'রাব্বানিয়ত' দর্শনের সরাসরি উলে- খ নেই তবু বইটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ড় এ দর্শনই প্রবহমান। প্রতিটি প্রসঙ্গকে 'রাব্বানিয়ত' এর দর্শনের সঙ্গে সূক্ষ্ম সুতা দিয়ে এমন নিপুণভাবে গ্রন্থিত করা হয়েছে যে, আমি এর রহস্য উদ্ঘাটন না করলে মেধা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীর পক্ষেও তা আবিষ্কার করা কষ্টসাধ্য হতো। লেখক 'রাব্বানিয়ত' এর একজন শক্তিশালী ব্যাখ্যাকার। কিন্ড়ু আমার কাছে এটা স্পষ্ট যে, লেখক ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর দর্শনকে পশ্চাতে ঠেলে দিয়েছেন এ ভয় থেকে যে, দর্শন প্রাধান্য লাভ করলে তাঁর আহ্বান দর্শনের সূক্ষ্ম বাছবিচারে হারিয়ে যেতে পারে।

'রাব্বানিয়ত' এর দর্শন এক বিপ- বী দর্শন। এর বিপ- বী আহ্বান এতোই শক্তিশালী যে, একটি মাত্র আঘাতেই ঐতিহ্যগত দার্শনিক চিন্ড়াধারা ও ধর্মের বিজ্ঞানের ভিতকে আমূল পরিবর্তন করতে পারে। এর দর্শন এমন অনুপম ও মহান যে এর সঙ্গে প্রাচীন কালের শ্রেষ্ঠ আদর্শসমূহের বা আধুনিক বস্ড়ুবাদী দর্শনের কোনো তুলনাই হয় না। 'দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম' বইটি রাব্বানিয়ত দর্শনের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গোড়ামি ও কুসংস্কারমুক্ত চিন্ড়ার আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। 'রাব্বানিয়ত' এর আলোকে আধুনিক সভ্য জগতের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়াদি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত সুস্পষ্ট ভাষায় তার বর্ণনা দেয়া কোনো সাধারণ লোকের কাজ নয়।

কিন্ডুডু 'দ্যা ক্রিড অব ইসলামের' লেখক এই অসামান্য কাজই বিস্ময়করভাবে নৈপুণ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। এমনকি যেসব স্থানে বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ড় ভুল করেন, সেসব স্থানেও তিনি হোঁচট খান নি। 'রাহমানিয়ত[২] নয়, বরং 'রব্বিয়ত'[৩] ই হচ্ছে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সকল গুণের উৎস—এ ইঙ্গিত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'দ্যা ক্রিড অব ইসলামের' লেখক 'রাব্বানিয়ত' দর্শনের রহস্যের সঙ্গে পরিচিত। লেখক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পূর্ণতা লাভের জন্যে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন 'রাব্বানিয়ত'কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়া উচিত। লেখকের এ দৃঢ় বিশ্বাস থেকে বুঝা যায় যে, তিনি সহজে ও স্বচ্ছন্দে 'রাব্বানিয়ত' দর্শনের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করতে সক্ষম।

আধুনিক পুঁজিবাদের হিংস্র পটভূমিতে নাস্ড়িকতাবাদী বস্ড়ুবাদ মানুষের বৈষয়িক চিন্ড়াকে এমনভাবে অভিভূত করেছে যে, বর্তমানে এটাই পরম বস্ড়ুবাদ বলে প্রায় সর্বজনীনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং নাস্ড়িকতাবাদী বাস্ড়বাদ আগামী দিনের জন্যে মানুষের বিশ্বজনীন ধর্ম, আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের এ ভবিষ্যৎবাণীর অকাট্যতা ও অপরিহার্যতার বির"দ্ধে প্রশ্ন উত্থাপনের সাহস পর্যন্ড় মানুষের নিঃশেষ হয়ে গেছে। 'দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম' 'রাব্বানিয়ত' এর জাদু স্পর্শে নাস্ড়িকতাবাদী বস্ড়ুবাদের 'মায়া' সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে, আগামী দিনের জীবনদর্শন 'স্থুল

বস্ড়ুবাদ' নয় বরং 'রাব্বানিয়ত'। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, ইসলাম ও মার্কসবাদী কমিউনিজম কি একই জিনিস নাকি এরা পরস্পর বিরোধী। 'দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম' গ্রন্থে অতীব যৌক্তিকভাবে দেখানো হয়েছে যে, ইসলাম ও মার্কসবাদী কমিউনিজম যেমন এক ও অভিন্ন নয় তেমনই পরস্পর বিরোধীও নয়। ইসলাম হচ্ছে সেই উৎস যেখান থেকে কমিউনিজম ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ এ দু'য়ের উদ্ভব ঘটেছে। একই উৎস থেকে সৃষ্ট পরস্পর বিরোধী দু'টি মতবাদ কমিউনিজম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে 'দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম' সম্পূর্ণভাবে বাতিল করেছে এবং একই সঙ্গে এ দু'টিকে এক অখ" সত্তায় একীভূত করার সঠিক পথের নির্দেশনা দান করেছে, যাকে জীবনের যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বিশ্বের জন্যে আশীর্বাদ বলেই মনে হবে।

বর্তমানের বিশ্বমানব যারা নিজেদের প্রগতিশীল বলে প্রচার করেন, তাদের ধারণা, প্রগতিশীল ও বৈপ- বিক মতবাদ হিসেবে ইসলামের ভূমিকা কার্যত শেষ হয়ে গেছে এবং ইসলাম কোনো গতিশীল মতবাদ নয় বরং এটা একটা স্থবির মতবাদ। তাদের ধারণা, ইসলাম যদি কোনো রকমে টিকে থাকতে পারে তবে তার সবচেয়ে বড় কাজ হবে এর অনুসারীদের প্রগতিশীল ও সভ্য জগতের ভিড় থেকে অনেক দূরে কোনো নির্জন গুহায় লুকিয়ে রাখা এবং পরকালের প্রতি তাদের আন্ড়রিক বিশ্বাসকে কমিউনিজমের হাত থেকে রক্ষা করা। বিশ্বব্যাপী এ বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্ড়ি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে 'দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম' অসীম সাহস ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে, প্রাথমিক যুগে

মদিনা রাষ্ট্রে ইসলামের যে প্রগতিশীল ও বৈপ- বিক ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছিলো তা ছিলো শুধুই নির্দেশনামূলক, সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রকৃত বিপ- ব এখনো শুর" হয় নি। লেখক 'দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম' গ্রন্থের মাধ্যমে সকল ইসলামপন্থি জনগণকে নিজেদের তৈরি গোপন গুহা থেকে বেরিয়ে এসে মারণাস্ত্রের এবং বৈরী মতাদর্শের বির"দ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। বইটির অবতরণিকায় লেখক বলেছেন, 'এখন সময় এসেছে প্রাথমিক যুগের পূর্ণতা নিয়ে পূর্ণ গৌরবে ধর্মের ফিরে আসার'—তার এ উক্তিটি সঠিক। গুহার মধ্যে বন্দি হয়ে থাকা ইসলামের কাজ নয়, বরং তাকে এখন অধিকতর বিস্ময়কর কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাই গুহা নয়, রণক্ষেত্রই হচ্ছে তার উপযুক্ত স্থান।

রাজনৈতিক বিপ- ব অধ্যায়ের যুদ্ধ ও শান্ড়ি প্রসঙ্গে 'দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম' গ্রন্থে লেখক এই মত প্রদান করেছেন যে, ইসলামি যুদ্ধ হচ্ছে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। একমাত্র এ বিষয়েই আমি লেখকের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। এ বিষয়ে আমার বিনম্র অভিমত এই যে, ইসলামে যুদ্ধ যেমন আত্মরক্ষামূলক নয় তেমনই আক্রমণাত্মকও নয়। যুদ্ধ যখন মানবজাতির কল্যাণ বয়ে আনবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে তখন ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয়, শুধু তাই নয় তখন যুদ্ধকে বাধ্যতামূলক করে। আমার ধারণা 'রাব্বানিয়ত' এর নীতি অনুসারে এটাই হচ্ছে ইসলামি যুদ্ধের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধের ফল যদি মানুষের জন্যে কল্যাণকর না হয় তাহলে আক্রমণাত্মক হোক কিংবা আত্মরক্ষামূলকই হোক সেটি-অকল্যাণকর এবং বর্জনীয়; কেননা এ ধরনের যুদ্ধের উৎপত্তি হচ্ছে 'নাফসানিয়াত'[৪] থেকে। সামান্য এ ব্যতিক্রম ছাড়া বইয়ের বক্তব্যের সঙ্গে আমার চিন্ড়াধারার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। আমার একজন ঘনিষ্ঠ সহচর, বন্ধু ও ভাই এ ধরনের একটি পুস্ড়ক রচনা করেছেন বলে আমি গর্বিত। 'দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম' এর লেখককে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকারী তাঁর 'রাব্বিয়ত' এর ছায়াতলে আশ্রয় দান কর"ন। আমিন।

আজাদ সুবহানী

১. 'রাব্বানিয়ত' হচ্ছে সেই গুণ যার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণ ও জীবন ব্যবস্থা 'রাব্বিয়ত' এর আলোকে নিয়ন্ত্রিত হয়।

২. 'রাহমানিয়ত' হচ্ছে আল- াহ'র সেই গুণ ও পদ্ধতি যার দ্বারা আল- াহ'র দানশীলতাকে বুঝায়।

৩. 'রাব্বিয়ত' হচ্ছে আল- াহ সেই গুণ ও পদ্ধতি যার দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও বিবর্তন নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪. 'নাফসানিয়াত' হচ্ছে সংকীর্ণ অর্থে অহমিকা কিন্ডু ব্যাপক অর্থে 'নাফসানিয়াত' দ্বারা আত্মমুখিতাসহ সেই মনোভাবকে বুঝায় যা নিজের আত্মতৃপ্তির জন্যে সবকিছুকে ব্যবহার করতে চায়। এটা 'রাব্বানিয়ত' এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

স্বীকৃতি

মাওলানা আজাদ সুবহানীর সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে তাঁর কাছ থেকে লেখক অনুপ্রেরণা ও মূল্যবান উপদেশ লাভ করেছিলেন। স্কুল ও কলেজ জীবনে বর্ধমান জেলার (মরহুম) মাওলানা আফতাব উদ্দিন আহমদ, যিনি দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডের ওকিং মসজিদে ইমামতি করেছেন, তাঁর কাছ থেকেও লেখক বিপুল উৎসাহ লাভ করেছিলেন। লেখক গভীর কৃতজ্ঞচিত্তে এসব মনীষীদের ঋণ স্বীকার করছেন।

অবতরণিকা

লেখক কখনো জানতেন না বা চিন্ড়াও করেন নি যে, বিশ্বে অগণিত বিজ্ঞ লোক থাকা সত্ত্বেও আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকেই এ ধরনের দুঃসাহসিক কাজের জন্য আহ্বান জানাবেন। শুধুমাত্র জন্মসূত্রেই নয়, লেখক তাঁর মুক্ত ও স্বাধীন ইচ্ছা ও অভির"চি অনুযায়ী একজন মুসলমান। বিশ্বের যেসব জাতি আল- াহ ও ধর্মে বিশ্বাস করে, সজ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক তারাই বর্তমানে আস্ড়িক জীবন দর্শনের সবচেয়ে বড় শত্র"। কেননা তারা কোনো না কোনো ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ভান করেন মাত্র। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মকে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জনগণকে শোষণ করা। আর প্রকারান্ড়রে এসব লোকই নাস্ড়িকতার সীমাহীন প্রসার ও বিস্ড়ারের জন্যে দায়ি। বর্তমান বিশ্বের খ্রিস্টান ও মুসলমানেরাই ধর্মকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করা এবং বিকৃত করার খেলায় প্রধান অংশীদার। এর কারণ এই যে, তাদের নিজস্ব স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র রয়েছে। তাই তাদের পক্ষেই সম্ভব নিজ-নিজ ধর্মের শিক্ষা অনুসারে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের নিজেদের ধর্মের জীবন্ড় রূপকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করার। তাছাড়া রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে সে সুযোগ এবং ক্ষমতাও তাদের রয়েছে। কিন্ড়ু তবু তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণের মাধ্যমে নিজ ধর্মকে প্রতিনিয়ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলছে।

তথাকথিত মুসলিম জাতিসমূহের ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ও রাজনীতিবিদরা তাদের ওয়াজ-নসিহত, প্রচারপত্র এবং সভাসমিতির মাধ্যমে প্রায়ই বলেন যে, পবিত্র কুরআন এবং হজরত মুহম্মদ (সা.)র শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুতির কারণেই মুসলমানদের অধঃপতন ঘটেছে এবং তারা অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। ভবিষ্যদ্বক্তার মতো তারা আরো বলেন যে, যতোদিন না মুসলমানেরা আল কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে ততোদিন পর্যন্ড় তারা তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে না। এ গতানুগতিক ও মামুলি বক্তব্যের পর তারা অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত ভাষায় আল- াহতে বিশ্বাস, সালাত আদায়, কোরবানি প্রদান প্রভৃতির জন্যে লোকজনকে হিতোপদেশ দেন এবং মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ধর্মবিরোধী উদ্দেশ্যকে সফল করেন। এ নোংরামির সবচেয়ে দুঃখজনক ও অসৎ দিক এই যে, মুসলমানেরা কোন্ নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে ব্যাপারে তাদের

নিজেদেরও কোনো ধারণা নেই। এসব নেতাদের অবস্থা ঠিক সেই লোকের মতো যে একজন পথহারা হতবুদ্ধি পথিককে বলে যে, সে পথ হারিয়েছে বলেই তার এতো দুরবস্থা, কিন্ডু সে সেই পথিককে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে না বা কোন্ মাইল পোস্টে পথিক পথ হারিয়েছে তাও বলতে পারে না।

নিজ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে লেখকের নিশ্চিত ধারণা, মুসলমানেরা একেবারে শুর“ থেকেই পথ হারিয়েছেন। তারা কলেমার বিষয়বস্ডু কী, তা যেমন জানেন না তেমনই ইসলামের মূলতত্ত্বের প্রতিও তাদের সক্রিয় বিশ্বাস নেই। 'মানুষের ভবিষ্যৎ ধর্ম হবে ইসলাম বা ইসলাম সদৃশ অন্য কিছু'—জর্জ বার্নাড শ'র এই বক্তব্যের সঙ্গে লেখক সম্পূর্ণ একমত। তবে লেখক মনে করেন এবং অনুভব করেন যে, খাঁটি ইসলামকে যদি এখন থেকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা না হয় তাহলে মানুষের ভবিষ্যৎ ধর্ম ইসলাম না হয়ে ইসলাম সদৃশ কিছু হবার সম্ভাবনাই বেশি।

বস্ডু ও আকার আকৃতির জগৎ, এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে পবিত্র কুরআন হচ্ছে মানুষের চিন্ড়া ও কর্মের দিশারি, এটা শুধুমাত্র পরকালের মুক্তির সনদ নয়; পৃথিবীতে মানুষের আচার-আচরণকে উন্নত ও পরিচালিত করা পবিত্র কুরআনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহও একই উদ্দেশ্য বহন করে। ধর্মগ্রন্থসমূহে পরকালের উলে- খ শুধু প্রাসঙ্গিকমাত্র।

ইসলামের মানবিক দিকগুলো বহু পূর্বেই ভুলে যাওয়া হয়েছে এবং বহু শতাব্দীর মধ্যে পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্ডু ও মূলতত্ত্ব তথা কলেমার মানবিক দিকগুলো সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস চালানো হয় নি। লেখক বিনয়ের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র পুস্ড়কে, কলেমার মানবিক মূল্যবোধকে পুনর“দ্ধার করে বিশেষ করে ইসলামকে এবং সাধারণভাবে সকল ধর্মকে মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জানার ভিত্তিস্থাপন করেছেন। তিনি আশা করছেন যে, প্রকৃত দক্ষ ও সত্যিকারের প্রতিভাবান ব্যক্তিরা লেখনির মাধ্যমে কলেমার এই বৈপ- বিক দিক উপস্থাপন করে মানুষের চিন্ড়া, অনুভূতি ও কর্মে পুনর্বার বিপ- ব ঘটাবেন। লেখক এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন যে, আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ও মানবতার শত্র“রা এ গ্রন্থের কারণে কালবিলম্ব না করে তার কুৎসা রটনাসহ তাকে অপমান করার চেষ্টা করবে। তিনি আরো অবগত যে, ধর্মের আধুনিক অভিভাবকেরা তাকে 'কাফের' বলে অভিহিত করবে এবং গোঁড়া নাস্ড়িকতাবাদীরা তাকে ধর্মের পুনর“জ্জীবন দানকারী বলে অভিশাপ দেবে।

সত্য ও স্বাধীনতার সৈনিকেরা সর্বযুগেই মুক্তি, স্বাধীনতা ও প্রগতির শত্র“দের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা নির্মম উৎপীড়নের স্বীকার হয়েছিলেন। চিন্ড়া ও কর্মের নবযুগ সৃষ্টিকারী নেতৃবৃন্দের সংগ্রাম ও দুর্দশার ইতিহাসই এই চিরন্ডন সত্যের জ্বলন্ড় প্রমাণ। সত্যের সৈনিকেরা তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের চূড়ান্ড় বিজয়ের আশায় নিজেদের বাঁচিয়ে রাখেন। সত্য অপরাজেয়। তাই প্রতিপক্ষ যতোই পরাক্রমণশালী হোক না কেন, সত্য ও ন্যায়ের

ওপর প্রতিষ্ঠিত যেকোনো নীতি ও আদর্শের জন্য পরিচালিত আন্দোলনের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

মানুষের বির্বতন প্রক্রিয়ায় পাদরি, প িত ও মোল- াদের দ্বারা স্তূপীকৃত জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্যে সংঘবদ্ধ নাস্ড়িকতাবাদ একটি প্রয়োজনীয় পর্যায় এবং ইতোমধ্যে সে তার করণীয় প্রশংসার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। এখন সময় এসেছে প্রাথমিক যুগের পূর্ণ গৌরব নিয়ে ধর্মের প্রাণশক্তির পুনরাবির্ভাবের।

আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নগণ্য ও কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে লেখক নিজের প্রথম গ্রন্থ 'দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম' চিন্ড়াশীল জনসাধারণের সামনে এই মানসিকতা নিয়ে উপস্থাপন করছেন, যে মানসিকতা নিয়ে বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি খালিদ-বিন-ওয়ালিদ মুতার যুদ্ধে স্বেচ্ছায় মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে ইসলামের ঝা াকে উড্ডীন রেখেছিলেন; যখন রাসুলুল- াহ (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত সকল সেনাপতিই যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদত বরণ করেছিলেন এবং এর ফলে নেতৃত্বে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। পরমদাতা ও দয়ালু আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত কর“ন এবং ইসলামকে মানুষের জীবনবিধান হিসেবে পুনরায় একটি জীবন্ড় শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত কর“ন।

আবুল হাশিম

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

মানবীয় কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা

বর্তমান বিশ্ব সতত পরস্পর বিরোধী যুদ্ধে লিপ্ত। যুদ্ধের লেলিহান শিখা দগ্ধ করছে সারা বিশ্বকে; এই শিখার দহন থেকে উইন্ডসর প্রাসাদের রাজা, হোয়াইট হাউসের ধনকুবের কিংবা আফ্রিকার জঙ্গলের দরিদ্র গুহাবাসী, কেউই রক্ষা পাচ্ছে না। এর কারণ মানুষের অতৃপ্তি। এ অতৃপ্তি মানুষের মাঝে যেমন গভীর তেমনই ব্যাপক। প্রয়োজন থাক বা না-ই থাক প্রতিটি ব্যক্তি ও জাতির প্রবৃত্তি হচ্ছে সম্ভাব্য সকল উপায়ে অন্যকে শোষণ করা। যুদ্ধের মাধ্যমে মানুষের এ প্রবৃত্তি খোলাখুলি প্রকাশিত হয়—মানুষ তখন নেমে আসে পশুত্বের পর্যায়ে। এ সময় মানুষ স্বগোত্রকে ধ্বংসের জন্য ব্যাপক হারে গণহত্যা এবং লুণ্ঠন করতে কার্পণ্য করে না। যুদ্ধক্ষেত্রের এ হত্যা ও লুণ্ঠন ব্যাপকতর হত্যা ও লুণ্ঠনের উন্মত্ততা সৃষ্টি করে। বিশ্ববাসী ক্ষতবিক্ষত হয়ে অবসাদগ্রস্ত না-হওয়া পর্যন্ত এমন যুদ্ধ চলতে থাকে। অবসাদগ্রস্ত মানুষেরা তখন কিছুকাল বিশ্রাম নেয় এবং এ বিশ্রামগ্রহণ কালকে তারা শান্তির কাল বলে আখ্যা দেয়। তথাকথিত এ শান্তিকালীন সময়ে মানুষ বৃহত্তর যুদ্ধের গোপন প্রস্তুতিগ্রহণ করে আর এ প্রস্তুতিকালকে কপট কূটনৈতিক ভাষায় যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনকাল বলা হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা জাতিসংঘ বাহ্যত যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য গঠিত হলেও এর আসল উদ্দেশ্য হলো পরবর্তী যুদ্ধের জন্য মিত্র সংগ্রহ করা। আমরা জানি মানুষে-মানুষে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে এবং জাতিতে-জাতিতে রয়েছে ঈর্ষা-উদ্দীপক স্বাতন্ত্র্য ও বৈপরীত্য। প্রত্যেকের মুখেই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বুলি লেগে থাকলেও এর সবই মিথ্যে ও উপহাস; যেন আধুনিক নারীর ঠোঁটের লিপস্টিকের মতো ক্ষণস্থায়ী। এমনই হচ্ছে আধুনিক সভ্য জগতের মানবিক কর্মকাণ্ডের বাস্তবচিত্র।

বর্তমান সময়ে মানবজাতি তার পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাহীন এবং সব রকমের প্রচলিত জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহী। তারা সব সময়ই মুক্তির পথ খুঁজছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সে মুক্তি কোথায়? দরিদ্র জনগণ মুক্তির পথ খুঁজতে আরো বেশি ব্যাকুল, কেননা শুধু বেঁচে থাকার জন্যে তাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবিরাম কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। বিনোদনের জন্য সামান্যতম অবসরও তারা পায় না। এসব দরিদ্র জনগণ অভাবের মাঝেই জন্মগ্রহণ করে, অভাবের মাঝেই জীবনধারণ করে আর অভাবের মাঝেই মৃত্যু তাদের আলিঙ্গন করে। জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার মতো সুযোগ তারা পায় না। আবার ধনীদের কথাই ধরুন, তারা কি সুখী? হ্যাঁ যদি প্রাচুর্য এবং সমারোহের মাঝে সুখের স্বাদ পাওয়া যায় তাহলে তাদের সুখী বলা যায়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। দুশো বছর আগে রুশো বলেছিলেন, 'মানুষ জন্মায় স্বাধীন, কিন্তু

সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত'—এ কথাটি আজও সত্যি। মানুষ তার পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পরিবেশ নামক কারাগারের সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যেই অতি- কষ্টে জীবনের পথ অতিক্রম করে এবং শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তাই ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে কোনো মানুষই সুখী নয়। আর এটাই হলো মানবজীবনের সাধারণ অবস্থা। ইতিহাসের এমন যুগসন্ধিক্ষণে কোনো না কোনো অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত মানুষ আবির্ভূত হন; যারা প্রথাগত ও সাধারণ জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন আর তার নিজের মনোনীত ব্যবস্থায় এক নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার জন্যে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কঠোর প্রচেষ্টা চালান। এভাবেই অতীত ও বর্তমানের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় নতুন ভবিষ্যৎ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোথাও সুখ খুঁজে পাওয়া যায় না। শৃঙ্খলিত মানবজাতি এক কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বন্দি হয় অপর কারাগারে। সে তার পূর্বপুরুষদের তৈরি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বন্দি হয় স্বরচিত কারাগারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে মানবজাতি কি কোনোদিনই মুক্তি পাবে না? অবিরাম কারাগার পরিবর্তনের নামই কি জীবন? পাখি যেমন পানিতে বা মাছ যেমন পানির বাইরে সুখী হতে পারে না, তেমনই মানুষও তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ কোনো পরিবেশে সুখ পেতে পারে না। অতীতের ভগ্নাবশেষের ওপর গড়ে উঠে ভবিষ্যৎ—একথা যেমন সত্য তার চেয়েও অধিকতর সত্য হচ্ছে, যে জীবনব্যবস্থা মানুষের দেহ, মন ও বুদ্ধিমত্তাসহ তার স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটানোর অধিকার ও সুযোগ প্রদান করে না বরং অজ্ঞতাপ্রসূত মিথ্যে নৈতিকতার আঘাতে তার প্রকৃতিকেই দমন-পীড়ন ও বিকৃত করতে চায়; সেই ব্যবস্থায়ও সে (মানুষ) সুখী হতে পারে না। মানুষ শুধুমাত্র সেই সমাজব্যবস্থায়ই সুখী হয়, যে সমাজব্যবস্থা তার (মানুষের) স্বাভাবিক প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা তার (মানুষের) মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে এবং এগুলোর পরিতৃপ্তির সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্দেশ করে। সমাজে এমন ব্যবস্থা চালু হলেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে দাসত্বের বন্ধন থেকে, লাভ করতে পারে সত্যিকারের স্বাধীনতা।

প্রকৃতির কোলে যখন মানুষ বসবাস করতো এবং প্রকৃতির প্রভাবেই যখন তার ভাগ্য হতো নিয়ন্ত্রিত, সে সময়ের কাহিনী আজ মানুষের বিস্মৃতির গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে বাহ্য দৃষ্টিতে যাকে মানুষের প্রকৃতি বলে মনে হয় সেটা আসলে তার সঠিক প্রকৃতি নয়, এটা তার কৃত্রিম রূপ—যা সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম উপায়ে, মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ অভ্যাসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে। তাই মানুষের মৌলিক প্রকৃতি উদ্ঘাটন করা খুবই কঠিন। আফিমসেবী ব্যক্তিরা যথাসময়ে আফিম গ্রহণ না করলে তাদের জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাই বলে আফিম খাওয়াকে তাদের প্রকৃতিগত অভ্যাস বলা যায় না। বরং আফিম খাওয়া তার একটি জঘন্য অভ্যাস—যা সে কৃত্রিমভাবে গড়ে তুলেছে এবং যা হচ্ছে তার স্বাভাবিক প্রকৃতির শত্রু। এভাবে কৃত্রিমভাবে তৈরি কিছু দৈহিক প্রয়োজন যেমন মানুষের প্রকৃতিকে বিকৃত করে ঠিক তেমনই মানুষের কৃত্রিম জড় পরিবেশ মানুষের মন ও বুদ্ধিমত্তাকে বিকৃত করে। আর বিকৃত দেহ, মন ও মানসিকতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় স্বাভাবিক মানুষ পরিণত হয় অস্বাভাবিক মানুষে। পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসকারী এসব অস্বাভাবিক মানুষ প্রতিনিয়তই প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়।

স্বাভাবিক প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের ক্ষুধার্ত আত্মা এভাবেই পরমাত্মার সঙ্গে তার যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছে; পরিণত হয়েছে অসুখী মানুষে। এসব অসুখী মানুষ অবিরাম সংগ্রাম করছে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যে। তারা অতীতকে ধ্বংস করে তার নিজের পছন্দ মতো ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করতে চাইছে; কিন্তু তার বিকৃত দেহ, মন ও বুদ্ধিমত্তা কীভাবে তাকে সত্যিকারে সুখ ও শান্তির সন্ধান দেবে? এসব বিকলাঙ্গ অঙ্গহীন মানুষের অনুভূতি ও চিন্তা যখন তার আসল প্রকৃতি প্রকাশ করতে পারে না, যুক্তি ও বুদ্ধি যখন অসহায়, তখন এসব অসুখী অন্ধ মানুষকে আলো জ্বেলে কে সঠিক পথ দেখাবে? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে জড় পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত এসব মানুষের যুক্তি, বুদ্ধি বা বিবেক ও ভাব তাকে সঠিক পথ দেখাতে পারে না বরং অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লব্ধ জ্ঞানই তাকে সঠিক পথ দেখাতে পারে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিবর্তনের ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে অধ্যয়ন করলে এ সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে, বহিঃইন্দ্রিয়ের নিরীক্ষণ ক্ষমতা দিয়ে নয়, বরং অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারাই যুগান্তকারী সকল আবিষ্কার ও সৃষ্টিকর্মের সূচনা হয়েছে। নিউটনের মধ্যাকর্ষণ শক্তি, এডিসনের বৈদ্যুতিক শক্তি, শেক্সপিয়র বা কালিদাসের মহাকাব্য, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, কার্ল মার্ক্সের উদ্বৃত্ত-শ্রম-মূল্যতত্ত্ব এগুলোর কোনোটিই আত্মমুখী যুক্তি ও বুদ্ধির অবদান নয়। এদের প্রত্যেকের মূলে রয়েছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রেরণা। হঠাৎ নিউটনের মনে উদিত হলো এক যুগান্তকারী প্রশ্ন—আপেল পড়ে কেন? নিউটন তার জীবনে বহুবার বৃন্তচ্যুত হয়ে আপেল পড়তে দেখেছেন কিন্তু এর আগে তার মনে কখনো এ প্রশ্ন জাগে নি। একইভাবে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক শক্তি। এ সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে রুশো শিখেছিলেন 'মানুষ জন্মায় স্বাধীন কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত'। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এ প্রত্যক্ষ সত্যের উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন দৃশ্যমান পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে লুক্কায়িত অন্তঃইন্দ্রিয়সমূহের সক্রিয়তা। এসব অন্তঃইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করে তুলতে হলে তাদের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করা প্রয়োজন। স্থূল ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর নির্ভরশীল মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধি তাকে তার জড় পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে না। তাই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী মানবজাতিকে তার প্রকৃত সত্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে তার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ও পাশ্চাত্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালায়। আজকের দিনেও মানুষ এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে নিজের দেহ, মন ও মস্তিষ্কের কুহেলিকা (বেদান্তবাদীরা যাকে বলেন Avidya) ভেদ করে সন্ধান পেতে পারে তার আসল প্রকৃতির। মানুষ কেবলমাত্র তখনই সুখী হতে পারবে যখন সে তার নিজের সত্যিকার স্বাভাবিক প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে এবং সত্যিকার স্বাভাবিক প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষ বাদ দিয়ে তার সঙ্গে পরিপূর্ণ ঐক্য ও শান্তিস্থাপন করবে। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে ধর্মে দৃঢ় হতে আহ্বান জানিয়েছেন। আর ধর্মকে বলা হয়েছে আল- াহ'র প্রকৃতি—যে প্রকৃতি মানুষের প্রকৃতিকে গঠন করেছে।

বুদ্ধি ও স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি

বুদ্ধি অনুভব শক্তি নয় বা বুদ্ধির সাহায্যে সরাসরি কিছু অনুভব করা যায় না। বুদ্ধির আসল কাজ কল্পনা করা এবং অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। মন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সবকিছু অনুভব করে। এই ইন্দ্রিয়গুলো দু'প্রকারের। প্রথমটি হলো চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এদেরই অনুরূপ অন্তঃইন্দ্রিয়সমূহ যাকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা যায়। এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সহজাত প্রবৃত্তি বা সাধারণ অভ্যাস নয়। তবে চোখ ও কানের মতোই এগুলোও ইন্দ্রিয়। আমাদের মনে রাখা উচিত পাঁচটি বহিঃইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ অনুভূতির একমাত্র উৎস নয়। এগুলোর সাহায্যে আমরা জড় আকার আকৃতি দেখি কিন্তু অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা পরিচিত হই বস্তুর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত প্রকৃত রূপের সঙ্গে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি জড় দৃশ্যের প্রতিফলন মাত্র এবং এজন্যে বুদ্ধি জড় পরিবেশের প্রেক্ষিতে মতামত গঠন করে এবং সব কিছু ব্যাখ্যা করে। কেবলমাত্র এই বিশেষ ও সীমিত অর্থে একথা সত্য যে, আমাদের সকল ধ্যানধারণা ও বিবেক আমাদের জড় পরিবেশেরই সৃষ্টি। কিন্তু মন যখন অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা আলোকিত হয় তখন একথা খাটে না। বুদ্ধি তখন জড় পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে প্রজ্ঞা ও সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার জন্ম দেয় এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সর্বময় কর্তৃত্ব। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে মনে প্রথম সৃষ্টির প্রেরণা জাগে এবং মন গর্ভবতী নারীর মতো একে ধারণ করে যথাসময়ে একটি বোধগম্য বাস্তব আকার ও রূপ দান করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দৃশ্যমান বস্তুকে দেখার জন্যে যেমন আলো ও বাতাসের মতো মাধ্যম প্রয়োজন তেমনই বস্তুর প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির একটি নিজস্ব মাধ্যম প্রয়োজন। এ মাধ্যমকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জ্যোর্তিকেন্দ্র বলা যায়। চোখ ও কান যেমন মানুষের দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের জ্যোর্তিকেন্দ্র, হৃদয়ও তেমনই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির জ্যোর্তিকেন্দ্র। অলৌকিক সত্যের জ্ঞান লাভ করা এবং নিরপেক্ষ বিবেক ও ধারণার অধিকারী হওয়ার জন্যে প্রয়োজন মন ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এ দুয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা। প্রাচ্যের মুনিঋষি ও সুফিবৃন্দ স্বজ্ঞা তথা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উন্নতির প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখেছিলেন। তাই প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম, দর্শন, আইন, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদির কোনোটিই এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে নি। জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখা তাদের বিকাশ ও ক্রমোন্নতির জন্যে প্রাচ্যের জ্ঞানী ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত মনের মনীষীদের কাছে ঋণী। ভারতীয় ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে ভারতীয় দর্শনের বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত ফ্রেডারিক শিগেল বলেছেন, **'মধ্যাহ্ন সূর্যের বর্ণিল আলোকছটার কাছে প্রমিউথিসের স্ফুলিঙ্গকে যেমন দুর্বল, কম্পমান ও নিভানো মনে হয়, প্রাচ্যদেশীয় ভাববাদের দর্শনের দীপ্তি ও তেজস্বীতার তুলনায় গ্রিক দার্শনিকদের সৃষ্ট ইউরোপের বৃহত্তম ভাববাদের দর্শনকেও ঠিক তেমনই মনে হয়'**। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উৎকর্ষ সাধন না করলে তা ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, আবার নির্ধারিত

ধারায় তার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করলে উত্তরোত্তর তার ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটতে থাকে। অতি উচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বা অতিসূক্ষ্ম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য ধ্বনি যা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় অতিপ্রাকৃত লব্ধ জ্ঞান। এই অতিপ্রাকৃত লব্ধ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা বর্জন এবং অতিপ্রাকৃত লব্ধ জ্ঞান বর্জিত বুদ্ধির ওপর জড় পরিবেশের প্রভাব বিস্ড়ারই হচ্ছে প্রাচ্যের অবনতির ও মৃৎবত অচেতনার কারণ। তাই প্রাচ্যের প্রতিভা পুনর"দ্ধার করতে হলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের তথা বোধির নিয়মিত উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন।

কোনো জড় দৃশ্যমান বস্ড়ুর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি যেভাবে নির্ণয় করা যায়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অস্ড়িত্ব ঠিক সেভাবে প্রমাণ করা যায় না, কেননা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়সমূহের ধরাছোঁয়ার বাইরের কোনো জিনিস। এজন্যে একে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে হয়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না বলে একে সত্য সন্ধানের অবলম্বন হিসেবে অবহেলা বা অস্বীকার করা উচিত নয় কেননা সত্য সন্ধানের অবলম্বন হিসেবে স্বজ্ঞার* অস্ড়িত্ব অবহেলা বা অস্বীকার করার চেয়ে মানুষের সুখশান্ড়ি ও প্রাকৃতিক ক্রমবিকাশের জন্যে অধিকতর মারাত্মক আর কিছুই হতে পারে না।

অদৃশ্যে বিশ্বাস

সত্যানুসন্ধানের পূর্বশর্ত হচ্ছে অদৃশ্যে বিশ্বাস। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আল- াহ'র ঘোষণা হচ্ছে যে এই সেই কিতাব, এতে সামান্যতমও সন্দেহ নেই; যারা সাবধানী এবং অদৃশ্যে বিশ্বাসী এই কিতাব তাদের পথপ্রদর্শক'(২:২-৩)। বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে দৃশ্যবস্ড়ু থেকে আরোহন, অবরোহন ও অনুমানের সাহায্যে অদৃশ্য ও অজ্ঞাতবস্ড়ু এবং ঘটনা সম্পর্কে সুপরিকল্পিত ও প্রণালীবদ্ধভাবে জ্ঞান আহরণ করা। স্থূল বহিঃইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভূত হয় এমন জড়পদাথ ও উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমকেই বস্ড়ুগত অর্থে বিজ্ঞা ন বলা হয়। কিন্ড়ু বিজ্ঞান এই বস্ড়ুগত অর্থেও মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। বরং যাকে দেখা হয় নি তাকে দেখার বা জানার শাশ্বত সংগ্রামই প্রগতির দীপশিখাকে চির অম্- ান ও উজ্জ্বল করে রেখেছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যাকে অনুভব করা যায় না তার কোনো অস্ড়িত্ব নেই, এটাকে যদি যথার্থ ও অভ্রান্ড় বলে ধরে নেয়া যায় তাহলে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থবিরতা আসবে এবং অদৃশ্যকে জানার সকল প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যাবে।

কারো কারো কাছে যেসব বস্ড়ু অদৃশ্য অন্যের কাছে তা দৃশ্য হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা খালি চোখে যেসব বস্ড়ু দেখা যায় না দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তা দেখা যায়। একইভাবে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে সাহায্যে যা দৃষ্টিগোচর হয় না তা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে দৃষ্টিগোচর হয়। বৈজ্ঞানিক অর্থে বা বিশেষায়িত অর্থে অদৃশ্য বলতে সেই সব বস্ড়ুকে বুঝায় যাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় না বা ধারণা করা যায় না কিন্ড়ু অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের সাহায্যে তাদের দেখা সম্ভব। তাই 'অদৃশ্য' শব্দটি একটি আপেক্ষিক শব্দ—এর ধরাবাঁধা কোনো অর্থ নেই। এর অর্থ অদেখা বস্ড়ু, কিন্ড়ু জ্ঞানাতীত বস্ড়ু নয়।

কিছু মানুষ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বস্ড়ু ও ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে যেমন সত্যকে জানতে চেষ্টা করে তেমনিভাবে কিছু মানুষ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে প্রকৃতির রহস্য পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে সত্যের অন্বেষণ করে। মুসা (আ.), ঈসা (আ.), বুদ্ধ বা হজরত মুহম্মদ (সা.) এঁরা সবাই ছিলেন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সত্যানুসন্ধানী। মানবজাতির প্রকৃতির ক্রমোন্নতি ও বিবর্তনের প্রত্যেক স্ড়রে প্রতিটি দেশে ও প্রতিটি জাতিতে এ ধরনের যুগান্ড়কারী নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেক জাতির কাছে পয়গম্বর প্রেরণ করেছি' (১৬:৩৬)**। এসব পয়গম্বর ও মহান ব্যক্তিরা সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন এবং বিশ্বপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে জীবনকে ব্যাখ্যা করেছেন। এঁরা মানুষকে এমন জীবনবিধান শিক্ষা দিয়েছিলেন যা বাস্ড়বক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল। বোকা ও অন্ধ থাকতে না চাইলে কোনো মানুষই যুক্তি ও বুদ্ধির দোহাই দিয়ে জ্ঞান ও প্রগতির ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানকে অবাস্ড়ব বলে প্রত্যাখ্যান বা অবহেলা করতে পারে না। নিজ অজ্ঞতাজনিত কারণে তাদের বক্তব্যকে ভালোভাবে না বুঝে পূর্ণ মানবতার আদর্শ এসব মহাপুর"ষকে পাগল বা প্রতারক বলে প্রত্যাখ্যান করা আর ভাস্কো-ডা-গামা, কলম্বাস, নিউটন বা ডারউইনকে স্বাপ্নিক বা বিলাসী গল্পকার বলে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। এসব মহাপুর"ষদের পরীক্ষার কোনো প্রয়োজন হলে তাদের চরিত্রের সততা, বিশ্বাসের গভীরতা, কর্মের বিশুদ্ধতা এবং এসবের মিলিত ফলাফলকে বিচার করা দরকার। কেউ যদি নিশ্চিত হতে পারেন যে, এসব মহাপুর"ষের সততা ও ন্যায়পরায়ণতা ছিল প্রশ্নাতীত, লব্ধ জ্ঞানের প্রতি তাঁদের ছিল অনড় বিশ্বাস এবং তাঁদের সে বিশ্বাসকে বাস্ড়বায়িত করার জন্যে তাঁরা চরম ত্যাগ স্বীকারসহ কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনে সুখশান্ড়ি এনে তাদের বিবর্তনের সঠিক পথে পরিচালনা করেছিলেন, তবে তাঁদের জ্ঞানকে সত্য বলে মেনে নিতে কারো দ্বিধান্বিত হওয়া উচিত নয়।

---

* বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা ছাড়াই মন বা হৃদয় যখন সরাসরি কোনো সত্তাকে উপলব্ধি করে তখন তাকে স্বজ্ঞা বলে অর্থাৎ স্বজ্ঞা হচ্ছে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অপর নাম। আল- ামা ইকবালের মতে, স্বজ্ঞাজাত অভিজ্ঞতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

(১) এ অভিজ্ঞতা পরম সত্তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতায় ব্যক্তি সমগ্র বাস্ড়ব সত্তাকে একই সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারে।

(২) স্বজ্ঞা হৃদয় বা অন্ড়ঃকরণের একটি বিশিষ্ট গুণ। স্বজ্ঞার মাধ্যমে বস্ড়ুর প্রকৃত রূপকে জানা যায়। এ জ্ঞানের বাহন হলো এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। এ জ্ঞান একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যা অন্যের কাছে হস্ড়ান্ড়র করা যায় না।

সত্য সন্ধানের জন্যে প্রাচ্যের ঋষিগণ তিনটি পথনির্দেশ করেছেন। এগুলো হচ্ছে ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান। ভক্তি বলতে মহাপুর ষদের আপ্তবাক্যে বিশ্বাসসহ ভগবানে বিশ্বাস, কর্ম বলতে সৎ ও কর্ম তৎপর জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত প্রজ্ঞায় বিশ্বাস আর জ্ঞান বলতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মাধ্যমে অর্জিত পা িত্য বুঝায়। পবিত্র কুরআনে 'ইমান' বা বিশ্বাস, 'আমল' বা সৎকাজ এবং 'ইলম' বা জ্ঞানের প্রসারের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি ও যুক্তিতে বিশ্বাসী ভাববাদের তথাকথিত উপাসকরা হিউম, মার্কস বা এঞ্জেলের বিশ্বাসের প্রতি বিশেষ গুর ত্ব আরোপ করেন, কিন্তু তারা নবী-রাসুল বা ঋষিদের নিয়ে উপহাস করতে কার্পণ্য করেন না। এ ধরনের মনোভাব যুক্তি ও বুদ্ধির জন্যে সম্মানজনকতো নয়ই বরং অপমানজনক।

শূন্যতাবাদ

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষের মনেই অজ্ঞেয়বাদ, নাস্ড়িকতাবাদ এবং শূন্যতাবাদ আসন গেড়ে বসেছে এবং কোনো একটির উপর বিশ্বাস স্থাপন এ যুগের প্রচলিত নীতিতে পরিণত হয়েছে। অজ্ঞেয়বাদ হচ্ছে মনের একটি অস্থির ও দোদুল্যমান অবস্থা। এ অবস্থায় জড়বস্ড়ু ব্যতীত অন্য সবকিছুর অস্ড়িত্বে এমনকি আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অস্ড়িত্বে মানুষ সন্দেহ পোষণ করে। নাস্ড়িকতাবাদ আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে পদার্থ এবং জড় আকার আকৃতি ব্যতীত সবকিছুর অস্ড়িত্বে দৃঢ়ভাবে অবিশ্বাস করে। অর্থাৎ নাস্ড়িকতাবাদীরা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অস্ড়িত্বে নিশ্চিতভাবে অবিশ্বাস করে। অজ্ঞেয়বাদ ও নাস্ড়িকতাবাদের শেষ পরিণতি হচ্ছে শূন্যতাবাদ। শূন্যতাবাদ যাবতীয় ধর্মীয় ও নৈতিক রীতিনীতি অবাস্ড়ব বলে প্রত্যাখ্যান করে এবং যা কিছু প্রতিষ্ঠিত ও বিধিসঙ্গত তারই বিরোধিতা করে। দর্শনের ভাষায় বলা যায়, শূন্যতাবাদ কোনো জিনিসেরই পরম ও শাশ্বত প্রকৃতিতে ও বাস্ড়বতায় বিশ্বাস করে না। অতীতকালে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে শূন্যতাবাদের বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা কদাচিৎ দেখা যেতো কিন্তু এখন এর প্রভাব বিস্তৃত। বর্তমানে শূন্যতাবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা চলছে এবং মানবজাতির এক প্রভাবশালী ও শক্তিশালী অংশ একে মানবজীবনের সকল প্রগতিশীল কর্মকা ের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। কেননা শূন্যতাবাদ সেই মনের সৃষ্টি, যে মন এমন কোনো কিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে অনিচ্ছুক। যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় না। মানুষের প্রকৃত সম্ভাবনা কতটুকু তা না জানার ফলেই এ মিথ্যে অহমিকার সৃষ্টি হয়েছে। বস্ড়ু ও বস্ড়্গাত অবস্থা ছাড়া শূন্যতাবাদ আর কিছুই স্বীকার করে না। এভাবে শূন্যতাবাদ মানুষকে তার বস্ড়্গাত পরিবেশের ক্রীতদাসে পরিণত করতে চায় এবং মানুষ যে তার জড় পরিবেশের প্রভাবকে অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে এ সত্যকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। শূন্যতাবাদীরা শাশ্বত ও অমর আত্মার প্রতি বিশ্বাসকে ঘৃণার সঙ্গে উপহাস করে এবং জড়বাদকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করে। লেনিনের মতে শূন্যতাপন্থি জড়বাদের বা মার্কসীয় কমিউনিজমের কোনো বাহ্যিক নৈতিকতা নেই এবং পার্থিব-অপার্থিব বা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক

প্রতিষ্ঠিত সকল ক্ষমতাকে উৎখাত করার জন্যে বলপ্রয়োগ ও সন্ত্রাস ন্যায়সঙ্গত। তিনি আরো মনে করেন 'মানুষের প্রধান শত্র ' ঈশ্বর বা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বির দ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া শূন্যতাপন্থি জড়বাদীদের প্রধান কাজ।

যেকোনো বস্ড়ুকে স্বীকার করার পূর্বে শূন্যতাবাদীরা বাস্ড়ব প্রমাণ দাবি করে; কিন্তু এই দাবি করতে গিয়ে তারা ভুলে যায় যে সাধারণ জড়বস্ড়ুর অস্ড়িত্ব প্রমাণ করারও দুটো পথ আছে—একটি হলো অভিজ্ঞতা আর অন্যটি বিশ্বাস। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস একটি বিশেষ অনুপাতে ও বিশেষ পদ্ধতিতে মিলিত হয়ে পানি উৎপন্ন করে এই সহজ সত্য সম্পর্কে কেবল তাদেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে যাদের রসায়ন বিজ্ঞানে জ্ঞান আছে। তবে সাধারণ মানুষ দু'টি পদ্ধতিতে এই সত্যকে গ্রহণ করতে পারে। প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে এ সম্বন্ধে যারা গবেষণা করেন, এ সত্য যারা প্রচার করেন তাদের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নির্দেশিত পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। যদি কোনো হতভাগ্য ব্যক্তি বিশেষজ্ঞদের উপর আস্থা রাখতে পারে না এবং তাদের দ্বারা নির্দেশিত পন্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সক্ষম হয় না বা অনিচ্ছুক হয় তাহলে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সে চির অন্ধ এবং জ্ঞানের দ্বার তার কাছে সম্পূর্ণ র দ্ধ। সত্য অনুসন্ধানের তৃতীয় কোনো পথ তার জানা না থাকার কারণে এ ধরনের মানুষ জড় বা অজড় কোনো কিছুতেই পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারে না। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণের জন্যে এ দু'টি পদ্ধতিকেই সমান উপযোগিতার সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। আরো সহজভাবে বলা যায়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় না এমন কোনো জিনিসকে সত্য বলে স্বীকার করতে হলে হয় নবী-রাসুলদের বা ঋষিদের প্রজ্ঞার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে অথবা তাঁদের নির্দেশিত পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এর সত্যতা বা অসত্যতা যাচাই করতে হবে। পূর্বেই উলে- খ করা হয়েছে যে, প্রাচ্য দেশীয় সুফি ও ঋষিবৃন্দ অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক জ্ঞান অর্জনের জন্যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে কীভাবে সক্রিয় করা যায় সে প্রণালি বিস্ড়ারিতভাবে সূত্রাকারে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় সাংখ্য ও যোগদর্শনের বিখ্যাত প িত 'কপিল' ও 'পতঞ্জলি' তাদের সাংখ্য ও যোগসূত্রের মধ্যে সুনিপুণভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেছেন। সুফিবাদের পাঁচটি শাখার মহান প্রবর্তক ও তাদের শিষ্যবৃন্দ এ বিজ্ঞানের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করেছেন। আর এভাবেই প্রাচ্যের এসব মহান ঋষি ও সুফিবৃন্দ তাঁদের পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে আমাদের কাছে অমূল্য উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন। কিন্তু বস্ড়্গাত সমৃদ্ধির তাৎক্ষণিক আরাম-আয়েশ দ্বারা বিপথগামী ও অন্ধ হয়ে প্রাচ্যবাসী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলোর উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধনে অবহেলা করে আসছে। ফলে প্রাচ্যবাসী প্রতিভাবানদের মধ্যে অবক্ষয় ও র গ্ণ অবস্থা বিরাজ করছে। প্রাচ্যবাসীর অতীতকালের সে গৌরবময় প্রতিভা ও তেজস্বীতাকে পুনর জ্জীবিত করার সামর্থের ওপরই নির্ভর করছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিগন্ড়ে তাদের পুনরাবির্ভাব।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি সমস্যাকে জটিল করে মানুষের দুঃখদুর্দশাকে বাড়িয়ে তোলে এবং প্রকৃতির সঙ্গে সর্বদা দ্বন্দ্বে লিপ্ত মানবজাতি সৃষ্টি করে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান বুদ্ধির পারস্পরিক সহযোগিতা মানুষের সুখশান্তি এনে দিতে পারে এবং তার আদি স্বাভাবিক প্রতিভা অনুসারে বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই বলা যায়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি সৃষ্টি করবে যন্ত্র আর অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসম্পন্ন বুদ্ধি সৃষ্টি করবে সত্যিকারের মানুষ। কুসংস্কার ও অহমিকাকে বিসর্জন দিয়ে প্রাচ্যের নবী-রাসুল ও ঋষিদের সঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে নিরপেক্ষ ও উদার মানসিকতা নিয়ে যদি জড়বাদের প্রবক্তা, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ সত্যকে জানার চেষ্টা করেন তাহলে তারা মানবজাতিকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন। আমার বিশ্বাস কেবল এভাবেই মানুষ তার প্রকৃত সত্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এমন জীবনবিধান গড়ে তুলতে পারবে যার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে তার প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সাদৃশ্য স্থাপিত হবে এবং মানুষ বিবর্তন ও জীবনসংগ্রামে পাবে প্রভূত আনন্দ ও পরিতৃপ্তি।

ধর্মের ধারণা

তথাকথিত যুক্তি ও বুদ্ধির জগতে ধর্ম সর্বাধিক অপব্যবহৃত শব্দ। বলা হয় ধর্ম হচ্ছে কুসংস্কার। মানুষের সকল দুঃখকষ্টের জন্য ধর্মকে দায়ি করা হয় আর প্রগতি ও উন্নয়নের জন্যে ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করা হয়।

পাশ্চাত্যের দেশসমূহে ধর্ম বলতে ধর্মশাস্ত্র বুঝায়—তাদের সংজ্ঞানুসারে ধর্মশাস্ত্র এমন একটি বিজ্ঞান যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী হবে সে বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রে কোনো স্থান নেই। তাই পাশ্চাত্যের ধারণা অনুযায়ী ধর্ম হচ্ছে মানুষের পার্থিব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক ব্যাপার। অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে মানুষের জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা। মানুষের পারলৌকিক জীবনই এর মুখ্য বিষয়। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে জীবনকে ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক জীবন—এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের ভার অর্পণ করা হয়েছে ঈশ্বরের উপর আর সামাজিক জীবনের ভার অর্পণ করা হয়েছে রাষ্ট্রনায়কদের উপর। কিন্তু এটাই যদি সত্যিকারের ধর্ম হয় তাহলে প্রত্যেকটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। ধর্ম সম্পর্কে বুদ্ধিমান লোকদের মাঝে এমন ধারণার সৃষ্টি ও বিস্তারের জন্যে ইউরোপের যাজক সম্প্রদায় এবং প্রাচ্য দেশীয় এক শ্রেণীর মোল- া ও পন্ডিতজনেরাই দায়ি। এসব মোল- া ও পন্ডিত তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অত্যন্ত অসৎ ও গর্হিতভাবে ধর্মের সম্মান ও সুনামকে ব্যবহার করেছেন। ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যাজক সম্প্রদায় সেখানে নানাভাবে প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিলো। তারা দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি আরোপ করে। এর ফলশ্রুতিতে সেই সমাজে নিরপেক্ষ ও সংস্কারমুক্ত জ্ঞানচর্চা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করলে দেখা যায়, স্বেচ্ছাচারী শাসকবৃন্দ এবং বিত্তবান শোষকশ্রেণীর মানুষেরা তাদের শাসন ও শোষণ চিরস্থায়ী করার জন্যে ধর্মের অনুমোদন নিতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যাজকদের ব্যবহার করেছিলো। এই পরিস্থিতিতে ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা হারিয়ে ফেলা অবশ্যম্ভাবী।

পার্থিব জীবনের সব আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে সন্ন্যাসকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করাকে আরবিতে 'রুহবানিয়াত' বলে। 'রুহবানিয়াত' পারলৌকিকতা শিক্ষা দেয় এবং একই সঙ্গে বস্তু-জগতের প্রতি ঔদাসীন্য ও বস্তু-জগৎকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেয়। বর্তমানে ধর্ম বলতে যা বুঝায় আরবি শব্দ 'রুহবানিয়াত'ই হচ্ছে এর একমাত্র সমার্থক। কিন্তু ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ করতে আরবিতে 'রুহবানিয়াত' নয় বরং 'রাব্বানিয়াত' শব্দই ব্যবহার করা উচিত। পবিত্র কুরআন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের 'রুহবানিয়াত'কে দৃঢ়ভাবে খুন করে একথা জোরালো ভাষায় ঘোষণা করে যে, যিশুখ্রিস্টসহ অন্যসব সত্যিকারের নবী-রাসুল আবির্ভূত হয়েছিলেন 'রুহবানিয়াত' নয় বরং কেবলমাত্র 'রাব্বানিয়াত' এর প্রচার ও প্রসারকল্পে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'কোনো ব্যক্তিকে আল- াহ কিতাব, ক্ষমতা ও নবুওত দান করার পর সে মানুষকে বলবে: আল- াহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও, এটা তার জন্যে সঙ্গত নয়; বরং সে বলবে: তোমরা রব্বানি[১] হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান করো এবং যেহেতু তোমরা নিজেরাও শিক্ষা গ্রহণ করো' (৩:৭৯)**। আরবি শব্দ 'রাব্বানিয়াত' বলতে বিশ্বের সৃষ্টি, প্রতিপালন ও বিবর্তনের প্রাকৃতিক তথা ঐশ্বরিক স্বাভাবিক দর্শনকে বুঝায়। হজরত মুহম্মদ (সা.) বলেছেন—**'ইসলামে রুহবানিয়াত তথা বৈরাগ্যের কোনো স্থান নেই'**। তাই পাশ্চাত্য মনীষীদের সংজ্ঞা অনুযায়ী ধর্ম বলতে যা বুঝায় এমন ধর্মকে অস্বীকার করা ইসলামেরও শিক্ষা।

ধর্ম সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধারণার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রাচ্যের মতবাদ অনুযায়ী ধর্ম মানবজীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করে। এখানে ধর্ম হচ্ছে সামগ্রিক জীবনদর্শন, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আরাধনার বিষয় নয়। আরবি 'দ্বীন' এবং সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দ দুটোকে ইংরেজিতে 'রিলিজিয়ন' বলে বিকৃত অনুবাদ করা হয়েছে। বস্তুত 'রিলিজিয়ন' শব্দ 'দ্বীন' ও 'ধর্ম' শব্দ দুটোর সঠিক ব্যাখ্যা নয়, বরং অপব্যাখ্যা। পবিত্র কুরআনে 'দ্বীন'কে 'ফিতরাত' বা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রকৃতি ও 'সুন্নাহ' বা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আইনের সমন্বয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং 'দ্বীন' ও 'ধর্ম' বলতে প্রকৃতির সেইসব নিয়মাবলীকে বুঝায় যার দ্বারা প্রকৃতির ভাগ্য পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আমরা জানি সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি গোত্র ও প্রতিটি প্রজাতি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, কেউই সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। তাই

---

১. ইসলামি ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত তফসিরুল কুরআনে বলা হয়েছে—রব্বানি অর্থ ইলাহের সাধক, রব থেকে রব্বানি শব্দের উদ্ভব। বিশেষ অর্থে আল- াহর জ্ঞানে যে জ্ঞানী এবং কর্মে ইহার বাস্তবায়নে যে বিশ্বাসী তাকেই রব্বানি বলে।

বলা যায় বিশ্ব একটি অখন্ড সত্তা, বিচ্ছিন্ন কতকগুলো খন্ডের সমষ্টি নয়। সৃষ্টির প্রতিটি অংশই বিশেষ বিশেষ নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হয় যার প্রতিটিই এক একটি বিজ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি যে নিয়মাবলীর দ্বারা চালিত হয় তা আলোচিত হয় জ্যোতিষশাস্ত্রে, জীবনের নিয়মাবলী নিয়ে আলোচনা হয় জীববিজ্ঞানে এবং ভুত্বক ও ভূ-অভ্যন্তরের যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানে। 'দ্বীন' ও 'ধর্ম' কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠান বা উপদেশ বাক্য বা পরলোকতত্ত্ব নয় বরং এ হচ্ছে সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান এবং সৃষ্টির কোনো কিছু ইচ্ছা করলেই 'দ্বীন' বা 'ধর্ম' বা প্রকৃতির নিয়মকানুনের সীমা অতিক্রম করতে পারে না। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে—**'আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ফিতরাত (প্রকৃতি), যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ'র সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' (৩০:৩০)।**

আজকাল ধর্ম বলতে যেমন ধর্মতত্ত্ব তথা কতিপয় উপদেশ বাক্য বা আচার-অনুষ্ঠান বুঝায় ইসলাম সে ধরনের কোনো ধর্ম নয়। বরং ইসলাম এমন এক বিজ্ঞান যার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। পাশ্চাত্যের পাদরি ও পুরোহিতগণ যেভাবে ধর্মের বিনাশসাধন করেছেন ঠিক তেমনিভাবে প্রাচ্যের তথাকথিত মোল্লা ও পন্ডিতরা 'দ্বীন' ও 'ধর্ম'কে বিকৃত করেছেন। এ কারণেই সর্বসাধারণের নিকট ধর্ম হয়েছে নিন্দনীয়। সত্যিকার অর্থে ধর্ম অযৌক্তিক কিছু নয় বা যুক্তির প্রতি, মুক্তচিন্তার প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন নয়। ধর্ম হচ্ছে আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রকৃতি আর সেই প্রকৃতি অনুযায়ীই বিশ্বব্রমান্ডের সকল নিয়মকানুনের সৃষ্টি হয়েছে। তাই ধর্মের জ্ঞান মানবজাতির জন্য অভিশাপ নয় বরং আশীর্বাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অতীতে ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে ধর্মকে ত্যাগ করার বা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারই আছে যা শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে; আনবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক ব্যবহার বিজ্ঞানের মানবতাবিরোধী কাজের সাম্প্রতিককালীন উদাহরণ। বিজ্ঞানকে সমাজবিরোধী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে শুধু এই যুক্তির ওপর নির্ভর করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার মধ্যে যেমন কোনো বিচক্ষণতা নেই ঠিক তেমনই ধর্মকে প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করা হয়েছে বা হচ্ছে বলে ধর্মকে পরিত্যাগ করার মধ্যেও বিচক্ষণতা বা প্রজ্ঞা নেই। বরং ধর্মের স্বনিয়োজিত অভিভাবক যেমন মোল্লা, পুরোহিত বা যাজকদের প্রতি কোনোরকম শিষ্টাচার প্রদর্শন না করে এবং তাদের ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করে বিশ্বের প্রতিভাবান লোকদের ওপর ধর্মের ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব অর্পণ করাই হবে সঠিক ও বিচক্ষণতার কাজ। একমাত্র এভাবেই ধর্ম আবার মানবজাতির জন্যে কল্যাণকর হয়ে দেখা দিয়ে মানুষের চিন্তা ও চেতনাকে সত্য পথে চালিত করতে পারবে।

দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও মুক্তচিন্তার অধিকারী ব্যক্তিগণ মুখে ধর্মকে যতোই অস্বীকার করুন না কেন মূলত তারা ধর্ম তথা প্রকৃতির নিয়মাবলীর পর্যালোচনা ও তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা ছাড়া কিছুই করেন না। অতিপ্রাকৃতলব্ধ উপায়ে মানুষের কাছে প্রেরিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির সেই সব মৌলিক রীতিনীতি যেগুলো

বিশেষভাবে মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যকথায় এসব অতিপ্রাকৃত জ্ঞান বিজ্ঞানের সেই মৌলিক সূত্রসমূহ তথা মানবপ্রকৃতির সেই মূল তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে—যা মানুষ স্বাধীনভাবে তার মেধার সাহায্যে অর্জন করতে পারতো না। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের কাল থেকে এ পর্যন্ত যত নবী-রাসুল বা মনীষীবৃন্দ আবির্ভূত হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিলো সেই অজানার প্রচার ও প্রসার। যেহেতু পর্যায়ক্রমে মানবপ্রকৃতি পরিণতি লাভ করেছে তাই মানব ও মানবপ্রকৃতি পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অতিপ্রাকৃতলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে মানবজীবনের নানা রহস্য মানুষের কাছে পর্যায়ক্রমে উদ্ঘাটিত হয়েছে। সব ধর্মগ্রন্থ তথা প্রত্যাদেশের উৎপত্তি একই উৎস থেকে,তাই তারা একে অপরের বিরোধী হতে পারে না। তবে মানুষের দ্বারা অন্যায়ভাবে সংযোজন ও বিকৃতি ঘটানোর ফলেই তাদের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ ও মানবপ্রকৃতির কাছে পূর্বতন প্রত্যাদেশগুলোকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হবে কেননা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে মানুষ যেভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে পূর্বতন প্রত্যাদেশগুলোও সেভাবে মানবপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেছে। ঐতিহাসিক ধারায় পবিত্র কুরআন প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থ। পবিত্র কুরআন যখন অবতীর্ণ হচ্ছিল সেই সময়ে মানুষের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটেছিলো। তাই পবিত্র কুরআন পূর্বের ধর্মগ্রন্থসমূহের মতো অপরিণত মানুষ ও তার প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা না করে ব্যাখ্যা করেছে পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ ও তার প্রকৃতিকে। পবিত্র কুরআন ঐতিহাসিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর পবিত্রতা সুরক্ষিত রয়েছে। পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে— **'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম' (৫:৩)**। এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো এমন এক সময়ে যখন মানুষ ও তার প্রকৃতি পূর্ণতা লাভ করেছিলো অর্থাৎ মানবজাতি যখন পূর্ণতা লাভ করেছিলো। তাই এরপর থেকে নিজেকে পরিচালনার জন্যে মানুষের আর কোনো পয়গম্বর বা ধর্মগ্রন্থের প্রয়োজন হবে না। কেননা মানুষ পবিত্র কুরআনের বাণী এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহের এমন বাণীসমূহ যা বিকৃত হয় নি তার সমন্বয়ে নিজ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে চিন্তা ও কর্মের দিশারি হিসেবে গ্রহণ করে নিজেকে অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে।

ধর্মের তথাকথিত সংজ্ঞার সঙ্গে ইসলাম প্রদত্ত ধর্মের সংজ্ঞার তুলনা করে অনেকের মনেই এ চিন্তার উদ্রেক হতে পারে যে, ইসলাম প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে বাদ দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ইসলাম কুসংস্কার ও মিথ্যাকে বর্জন করে ধর্মের আদি সৌন্দর্যকে পুনরুদ্ধার ও রক্ষা করেছে। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, তথাকথিত মুসলিম জাতিসমূহের স্বেচ্ছাচারী শাসকগণ এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মোল্লার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে ইসলামের পবিত্রতাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে সফলভাবে ঠেলে দিয়েছেন এবং কুসংস্কার ও মিথ্যে বিশ্বাসের দ্বারা মেঘাচ্ছন্ন করে ঢেকে রেখেছেন। যেহেতু ধর্মে অন্যায়ভাবে কোনোকিছু সন্নিবেশ করা সম্ভব নয় তাই এ কাজগুলো তারা করেছেন অসাধুভাবে ধর্মের অভিসন্ধিমূলক অপব্যাখ্যার মাধ্যমে। বিশ্বের প্রভাবশালী

মনীষীদের অজ্ঞতা থেকে ও অযৌক্তিক চিন্ড়াসর্বস্ব মোল- া, প ত ও পুরোহিতদের হাত থেকে ইসলাম ও ধর্মকে রক্ষা করতে জ্ঞানীদের এগিয়ে আসা একান্ড় কর্তব্য। জ্ঞানী ও মনীষীরা তাদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সঙ্গে বুদ্ধির, প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্তির এবং বিশ্বাসের সঙ্গে কর্মের সংযোগসাধন করে ধর্মকে পুনরায় মানবজাতির জন্যে পরম আশীর্বাদে পরিণত করতে এগিয়ে আসবেন অশান্ড়িতে নিমজ্জিত মানবসমাজ আজ তা-ই কামনা করে।

ফিতরাত ও কুদরাত

'ফিতরাত' বলতে প্রকৃতিকে বুঝায় অপরদিকে 'কুদরাত' বলতে প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের সৃষ্টি, বিবর্তন ও প্রয়োগ সম্পর্কিত আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার গুণবাচক নামকে বুঝায়। 'ফিতরাত' বা প্রকৃতি অন্ধ, অপরদিকে 'কুদরাত' সচেতন এবং এর বিচক্ষণতা ও ইচ্ছাশক্তি আছে। ভারতীয় হিন্দু জনগণ ব্রহ্মসূত্রসমূহ বা প ত বাদরায়নের বেদান্ড় দর্শনকে ঐশীশক্তির ধারণার পক্ষে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও অভ্রান্ড় দলিল বলে মনে করেন। তবে বেদান্ড়বাদীদের মাঝেও এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বাদরায়নের দু'জন বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার শ্রীশঙ্করাচার্য ও আচার্য রামানুজের মধ্যেই মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শঙ্করাচার্যের মতানুসারে ব্রহ্ম বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর 'নির্গুণ' অর্থাৎ তার কোনো গুণ নেই। তিনি এই বিশ্বাসে এতোই অটল যে, ব্রহ্মের বুদ্ধি আছে বলেও তিনি মনে করেন না। তার অর্থ, বুদ্ধি ব্রহ্মের কোনো গুণ নয় বরং ব্রহ্ম নিজেই বুদ্ধি। অপরদিকে রামানুজ বিশ্বাস করেন যে, ব্রহ্ম 'সগুণ' অর্থাৎ গুণের অধিকারী। সেজন্যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ব্রহ্ম বুদ্ধি, শক্তি ও ক্ষমা ইত্যাদি গুণের অধিকারী।

শূন্যতাপন্থি জড়বাদী ঋষিরা 'ফিতরাত'কে স্বীকার করেন কিন্ড়ু 'কুদরাত'কে অবজ্ঞা ও ঘৃণার সঙ্গে অস্বীকার করেন। জ্ঞান মানুষকে দাম্ভিক করে না বরং তার অজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। বর্তমান কালের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা এই যে, এ যুগে ফিতরাতের রহস্য আবিস্কৃত হওয়ায় মানুষ ভাবছে যে, সৃষ্টি হচ্ছে একটি স্বয়ংক্রিয় ঘটনা এবং মানুষ তার মেধার সাহায্যে 'ফিতরাতের' ওপর তার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। 'কুদরাত' (অর্থাৎ আল- াহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) 'ফিতরাত' এর স্রষ্টা এবং তিনিই তার সৃষ্টিকে তত্ত্বাবধান করেন। মানবপ্রকৃতি যেহেতু বিশ্বপ্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই মানবপ্রকৃতিকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জানা প্রয়োজন।

জীবনে মানুষ যে নগণ্য জ্ঞান অর্জন করে তা অসম্পূর্ণ ও ত্র ্টিপূর্ণ। আর এজন্যে মানবপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার পক্ষে এ জ্ঞান পর্যাপ্ত নয়। টেলিস্কোপ ও মাইক্রোস্কোপ মানুষের কাছে বিশ্বের বিরাটত্ব ও তার সীমাহীন প্রকৃতিকে প্রকাশ করে 'কুদরাত' থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মানুষের ক্ষুদ্রত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে মানুষের সম্ভাবনা অপরিসীম। মানুষ 'কুদরাত' থেকে আসে আর 'কুদরাতে'ই বিলীন হয়। মেঘ থেকে যে একবিন্দু পানি পড়ে, তাতেও সমুদ্রের উপাদান ও

কার্যকারিতা থাকে। সে সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয় আর সমুদ্রেই ফিরে যায়। ক্রম পরিবর্তনের ধারায় একফোঁটা পানি তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে পারে যদি ফোঁটাটি তার উৎসের সঙ্গে নিরবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রাখে। যদি ভূ-গর্ভের অনন্ড় প্রবাহ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তবে সমুদ্রে তার প্রত্যাবর্তন বিলম্বিত হবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ড় তার 'ফিতরাত' তাকে সমুদ্রে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। মানুষের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি তদ্র প। মানুষ যদি 'কুদরাত' এর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলে কেবলমাত্র তখনই তার কর্মক্ষমতার সহজ ও স্বাভাবিক উন্নয়ন ঘটতে পারে। শুধুমাত্র 'ফিতরাত' সম্পর্কে অস্পষ্ট জ্ঞান নিয়ে মানুষ কখনো বিশ্বপ্রকৃতির মূলতত্ত্বের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটাতে পারে না। মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ও ত্র ্টিপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে মানুষ যে জীবন গড়ে তোলে সেটা তার আসল প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হতে বাধ্য এবং তা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিলম্ব ঘটায়। তবে মানুষের প্রকৃতি তাকে কঠোর শাস্ড়ির দ্বারা সংশোধন করে পরিশেষে বিবর্তনের মূলধারায় ফিরে যেতে অবশ্যই বাধ্য করে।

মানুষ তার পারিপার্শ্বিক জড় পরিবেশ থেকে অর্জিত স্বল্প জ্ঞানের অহমিকায় প্রতিনিয়ত নিজের প্রকৃতির বির দ্ধাচরণ করে। কাজেই তার এ অহমিকা এবং প্রকৃতির বির দ্ধে বিদ্রোহ তার সকল দুঃখদুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'কুদরাতে' বিশ্বাস, কল্পনাপ্রসূত বা ভয় থেকে সৃষ্ট নয়। এ এক বাস্ড়ব সত্য। একে অস্বীকার করে মানুষ কখনো নিজেকে সত্যিকারভাবে জানতে পারে না। ভারতীয় দর্শনে 'ফিতরাত'কে বলা হয় 'প্রকৃতি' আর 'কুদরাত'কে বলা হয় 'পরম পুর ষ' বা 'পরমাত্মা'। মনীষী কপিল তাঁর 'প্রত্যক্ষ', 'অনুমান' ও 'আপ্তবচন' ইত্যাদি প্রমাণ পদ্ধতির সাহায্যে বেদান্ড়বাদীদের বর্ণিত 'ঈশ্বর' এর অস্ড়িত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন। তবু তিনি 'পুর ষ' নামক এমন এক শক্তিতে বিশ্বাস করেন যা 'প্রকৃতি' বা 'ফিতরাত'কে সক্রিয় করে রাখে। তৎকালীন সময়ের ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতি আস্থা না থাকলেও দার্শনিক হিউম ব্যতীত সে যুগের অন্যান্য দার্শনিকদের প্রায় সবাই 'কুদরাতে' বিশ্বাসী ছিলেন। পে- টোর বিশ্বাস ছিলো যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে কোনো জাতি কখনো শক্তিশালী হতে পারে না। তাঁর মতে, শুধুমাত্র জাগতিক শক্তি, আদি কারণ বা 'এলান ভাইটাল' মানুষের মনে আশা, আস্থা ও সাহস এনে দেয় না বরং একজন জীবন্ড় ঈশ্বরে বিশ্বাসই মানুষের লোভ ও অহমিকাকে দমন করতে পারে এবং তাকে সংযম ও আত্মত্যাগ শিক্ষা দিতে পারে। তিনি আরো মনে করেন, একজন জীবন্ড় ঈশ্বরের বিশ্বাস থেকেই মানুষের মনে ব্যক্তিগত অমরত্বে বিশ্বাস দানা বেঁধেছে। আমরা জানি, পে- টো কল্পনাবিলাসী বা সংকীর্ণমনা দার্শনিক ছিলেন না। তিনি দর্শন বলতে জ্ঞানের এমন উৎকর্ষতা বুঝতেন যা মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দিশারি হতে পারে। এরিস্টটল বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর বিশ্বকে চালনা করেন। তবে তিনি (ঈশ্বর) শুধুমাত্র যান্ত্রিক শক্তির মতো বিশ্বকে চালনা করেন না, বরং তার সমস্ড় ক্রিয়াকর্মের মধ্যে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। চ্যান্সেলর বেকন, যিনি তাঁর সমকালীন সময়ের সবধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের বির দ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন তিনিও 'কুদরাতে' বিশ্বাস করতেন। তাইতো তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিলেন 'বিশ্বপ্রকৃতি মনহীন

একথা বিশ্বাস করার থেকে পৌরাণিক, তালমুদ ও আল কুরআনের সব উপকথা বিশ্বাস করা ভালো'। ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি বির"দ্ধ মনোভাব সৃষ্টি হওয়া বেকনের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কেননা তিনি পাদরি, পুরোহিত ও মোল- াদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্মকে অধ্যয়ন করেছিলেন। ডারউইন ও স্পেনসরের অবদান জীববিজ্ঞানের জগতে মানুষের গতানুগতিক ধ্যানধারণার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁরা তাঁদের আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানভা"ারকে সমৃদ্ধ করলেও এর দ্বারা অনেকে আবার বিপথগামীও হয়েছিলেন। স্পেনসর 'কুদরাত' এর স্বরূপ সঠিকভাবে নির্ধারিত করতে পারেন নি কিন্তু তিনি এর অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। তাঁর মতানুসারে মন ও জড়পদার্থ দুটোই সমভাবে আপেক্ষিক। দুটোই চরম ও পরম কারণের দ্বিগুণীকৃত ফল। আর এই কারণের স্বরূপ উদ্ঘাটন অসম্ভব। ফ্রান্স ও ইউরোপের তদানিন্তন যাজক সম্প্রদায়ের মতে ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক ভলটেয়ার ছিলেন সে যুগের ঘোরতর 'নাস্তিক'। তিনি প্যারিসে মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি গ্রাম্য গির্জাপ্রাঙ্গণে গোপনে সম্পন্ন করতে হয়েছিলো। তবে তিনি অজ্ঞাবাদী, নাস্তিক বা শূন্যতাবাদী ছিলেন বলে যাজক সম্প্রদায় কর্তৃক নিগৃহীত হন নি বরং তিনি চার্চের নির্বোধ ও অযৌক্তিকতা প্রসূত তত্ত্ব বা মতবাদ মেনে নিতে পারেন নি বলেই নিগৃহীত হয়েছিলেন। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং একই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রকৃতি তথা 'ফিতরাত' এর সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্কের ওপর ভলটেয়ারের বিশ্বাস ছিলো ধ্র"বতারার মতো সত্য ও অটল। তিনি বিশ্বাস করতেন, সত্যিকারের প্রার্থনার অর্থ প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করতে চাওয়া নয় বরং এর অর্থ হচ্ছে এই নিয়মাবলীকে ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা বলে স্বীকার করা। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর মতের সঙ্গে পবিত্র কুরআনের বর্ণিত মতের কোনো পার্থক্য নেই। স্পিনোজা যিশুখ্রিস্টের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করতেন না, তবে ঈশ্বর ও প্রকৃতি একই সত্তা একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন প্রয়োজনের তাগিদে এবং অপরিবর্তনীয় নিয়মের দ্বারা এরা নিয়ন্ত্রিত। তাই স্পিনোজা এই মহৎ নিয়মকে মেনে চলতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হচ্ছেন কান্ট। তিনি জার্মানির এক প্রবাদপুর"ষ—যিনি 'বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা' এবং 'অলৌকিক দ্বন্দ্ববাদ' এর সমালোচনায় ভারতীয় প"িত কপিল ও পতঞ্জলির মতো অনুভূতি, উপলব্ধি ও চিন্তাশক্তির ধর্ম সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন, তিনিও মানবাত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন এবং মনে করেন যে, এই অমরত্বের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বে অকুণ্ঠ বিশ্বাস অপরিহার্য।

জার্মানি স্পিনোজা, কান্ট, সফেনহোর, হেগেল, নিটশে এবং কার্ল মার্ক্সের মতো একদল যুগান্তকারী চিন্তাবিদ ও দার্শনিকের জন্ম দিয়েছে। কার্ল মার্ক্স অর্থনীতিতে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মৌলিক অবদান রেখেছেন। তাঁর উদ্বৃত্ত-মূল্য-তত্ত্ব নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। কিন্তু তাঁর বা তাঁর বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলের চিন্তাকে দার্শনিক দৃষ্টিতে মোটেও মৌলিক বলা চলে না। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে হেগেলের

দ্বন্দ্ববাদ ও হিউমের জড়বাদের যৌগরূপ সৃষ্টি করার মাধ্যমে। কার্ল মার্ক্স বিশ বছর যাবৎ ব্রিটিশ জাদুঘরে মানুষের জড়জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যথেষ্ট পড়াশোনা করেছেন। তবে তিনি প্রাচ্যের ধর্ম বা দর্শনের মূল গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। যতোটুকু জানা যায়, আরবি ভাষা শেখার প্রতি তাঁর সুপ্ত ইচ্ছা ছিল এবং এ ভাষা শেখা তিনি শুর"ও করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আরবি ভাষা শেখার আগেই তিনি মারা যান (পবিত্র কুরআন থেকে ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি)। তাই তাঁর শূন্যতাবাদ মনোবৃত্তি তৎকালীন গির্জাসর্বস্ব ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া বা বির"দ্ধাচরণ। কার্ল মার্ক্সের পরবর্তী উত্তরসূরি লেনিন ও স্টেলিন এ ব্যাপারে যে উন্মাদনা প্রদর্শন করেছেন তার তুলনা ইতিহাসে মেলে না। পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র এবং ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর কিনা এ ব্যাপারে মস্কোর বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এই মতামত ব্যক্ত করেন যে, এ ধরনের বিয়ে দোষনীয় নয়। তাই সোভিয়েত আইনে এ জাতীয় বিয়ে নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে এরূপ বিয়ের বির"দ্ধে সংস্কার আছে বলে সেখানেও এ জাতীয় বিয়েতে উৎসাহ দেয়া হয় না। এটা হলো অহমিকা ও অজ্ঞতার জ্বলন্ত নিদর্শন। জীববিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষের এমন পরিপক্ক হয় নি যে তারা পরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে জীবনের জটিল রহস্য সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। কেউ যদি এরূপ মনে করে যে, সে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছে তাহলে এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতা ও শিশুসুলভ আর কিছুই হতে পারে না। প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে, 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী'। শূন্যতাপন্থি জড়বাদের অহমিকা ও দাম্ভিকতার ক্ষেত্রে এ প্রবাদটি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য।

মানুষ মনে করে যে, সে 'ফিতরাত'কে জয় করতে পারে। একই সঙ্গে মানুষ 'ফিতরাত' এর যেটুকু রহস্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছে তা থেকেই সে মনে করে যে প্রকৃতিকে সে জয় করে ফেলেছে। অথচ সে জানে না, প্রকৃতিকে জানা যায় কিন্তু জয় করা যায় না। মানুষ প্রকৃতিকে শাসন করে না বরং সে-ই প্রকৃতি দ্বারা শাসিত হয়। অপরদিকে 'কুদরাত' প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। কার্যকারণের এক অন্তহীন শৃঙ্খল সত্যানুসন্ধানীকে সকল কারণের উৎস 'কুদরাত' এর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। 'কুদরাত' বা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রকৃতির মধ্যে এবং মানবজীবনের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। 'কুদরাত' এর অস্তিত্বের প্রমাণ লাভের জন্য পবিত্র কুরআন প্রকৃতিকে জানার জন্যে এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির উত্থানপতনের কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যে নির্দেশ দেয়। পবিত্র কুরআনে আমরা পাই—**'নিশ্চয়ই আকাশম"ল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্যে কল্যাণ রয়েছে। আর আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, এর দ্বারা মৃত জমিনকে সজিব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীবজন্তু। আর আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা আছে সবই তার হুকুমের অধীনে আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ করে—নিশ্চয়ই সেসব বিষয়ের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে'** **(২:১৬৪)**। পবিত্র কুরআনে মানুষকে বারবার উপদেশ দেয়া হয়েছে বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ

করতে এবং অতীতের জাতিসমূহের উত্থানপতনের কারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে। পবিত্র কুরআন তাই বলেছে—**'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিলো। আকাশ ও পৃথিবীতে কোনো কিছুই আল- াহকে পরাভূত করতে পারে না। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান' (৩৫:৪৪)**। অন্ধপ্রকৃতি সম্পর্কে অন্ধভাবে জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা মানুষকে অন্ধকার গলিতে ঠেলে দেবে আর সেখানে সে হতবুদ্ধি অবস্থায় বিশৃঙ্খলতার মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে। পবিত্র কুরআনে তাই স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে—**'হে মানুষ! তোমরা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মুখাপেক্ষী; আর আল- াহ, তিনি অভাবমুক্ত ও প্রশংসার যোগ্য' (৩৫:১৫)**। সুতরাং মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা লাভের জন্যে 'কুদরাত' এর উপর জ্বলন্ড় বিশ্বাস রাখা বিজ্ঞানসম্মতভাবে একান্ড় প্রয়োজন। তাই 'কুদরাত' এর সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষ মহান, অপরদিকে 'কুদরাত' থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ অতি ঘৃণ্য।

ইসলাম

যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সময়ে তাদের ওপরই ইসলামের প্রতিনিধিত্বের ভার পড়েছে। ইসলামের এইসব আধুনিক অভিভাবক যদিও নিজেদের উলামা বা জ্ঞানী বলে দাবি করেন তথাপি তারা মধ্যযুগীয় আরবি স্কুলে সামান্য দর্শন, আইন ও ধর্মতত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই পড়াশোনা করেন না। খুলাফায়ে রাশেদিনের সর্বশেষ খলিফা হজরত আলী (রা.) এর মৃত্যুর পর ইসলামি আদর্শ ও ধারণার ক্রমশ অধঃপতন ঘটছে। মুসলমানদের মাঝেও ইহুদিদের মতো গোত্র ও বর্ণগতভাবে নিজেদের একটি জাতিতে পরিণত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। জাতি, বর্ণ ও দেশ নির্বিশেষে যে ইসলাম ছিলো মানুষের পথের দিশারি সেই ইসলামই বাগদাদের আব্বাসীয় রাজত্বের সময় পরিণত হয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসভিত্তিক এক থিওলজি বা ধর্মতত্ত্বে। এর শোচনীয় পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে, ইসলামের মানবিক দিকগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলিত হয়েছে আর শেষ পর্যন্ড় তা চলে গেছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। এভাবে ইসলাম আবদ্ধ হয়েছে উপাসনা আর আচার- অনুষ্ঠানের সংকীর্ণ সীমানায় আর মানবজীবনের অন্যান্য দিক থেকে তাকে করা হয়েছে বিচ্ছিন্ন। যেসব রীতিনীতি, ক্রিয়াকর্ম বা অনুষ্ঠান ইসলামের প্রকৃতরূপকে ব্যাখ্যা না করে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে, ইসলামের আধুনিক অভিভাবকরা হলেন তারই পুরোহিত। এসব কারণেই ইসলাম বাহ্য দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় ও কুৎসিত মনে হয়। আর এর ফলে মানুষের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ইসলাম হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সমষ্টিগত জীবন। অন্যকথায়, ইসলাম হচ্ছে তার অস্ড়িত্ব ও ভবিষ্যতের বিজ্ঞান। ইসলাম যাতে পুনরায় গৌরবময় ও প্রগতিশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে সেজন্যে প্রয়োজন ইসলামের মানবিক মূল্যবোধকে পুনরায় আবিষ্কার

করে তাকে আধুনিক পটভূমিতে স্থাপন করা। আর এ কাজ করতে হবে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক প্রভৃতি প্রতিভাবান লোকদের সহায়তায়।

ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ শান্ড়ি। দ্বন্দ্ব ও সংঘাত আছে বলেই শান্ড়ির প্রশ্ন আসে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'যে পরিবেশ সব সময় বিকাশের প্রতিকূল সেই পরিবেশে বিকাশ ঘটা বা না ঘটার নামই জীবন'। সুতরাং জীবন হচ্ছে অন্ড়রে এবং বাইরে পরস্পর বিরোধী চিরন্ড়ন দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এর সমন্বয়। বাহ্যদৃষ্টিতে আমরা জীবনের যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখি তার নিজস্ব বাস্ড়ব সত্তা নেই। এগুলো হচ্ছে অন্ড় র্দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। মানুষের অহমিকা ও পরার্থপরতার মধ্যে যে অন্ড়র্দ্বন্দ্ব চলতে থাকে তারই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে অর্থনৈতিক শ্রেণিসংগ্রাম। অহমিকা ব্যক্তি ও বিশ্ব মানুষের মঙ্গলের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে সবকিছুকে তার নিজের দেহ মনের আশু প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চায়। অন্যদিকে পরার্থপরতা মানুষের অহংসত্তা বা অহমিকাকে শাসন করতে চায়। ইসলাম মানব প্রকৃতিকে দমিয়ে রাখতে চায় না বা তার ওপর জোরজুলুম চালায় না। বরং ইসলাম মানুষের দেহ, মন ও মস্ড়িষ্কের স্বাভাবিক প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়ে মানুষের পূর্ণাঙ্গ কর্মক্ষমতার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে চায়। তবে ইসলাম সবসময়ই এ বিষয়ের প্রতি নজর রাখে যে, এতে করে যেন কোনো অবস্থায়ই অন্যের অনুরূপ অধিকার খর্ব না হয় অথচ নিজের অহংসত্তা বা অহমিকা সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হয়।

অহমিকা নিজের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার স্বপক্ষে নৈতিক ও মানসিক সমর্থন লাভের জন্যে স্বার্থপরতাসর্বস্ব নিজস্ব নীতিমালা সৃষ্টি করে বুদ্ধিকে পরাভূত করতে চায়। অপরদিকে, পরার্থপরতা অহমিকাকে দমন করার জন্যে তার নিজস্ব নীতিমালা তৈরি করে এবং তার পক্ষে মানসিক সমর্থন লাভের জন্যে বুদ্ধিকে পরাভূত করতে চেষ্টা করে। এভাবে অহমিকা এবং পরার্থপরতা এই উভয় মনোবৃত্তি অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় মানুষের অন্ড়রের ও বাহিরের জগতে একটা অবাস্ড়ব অবস্থার সৃষ্টি করে। এর ফলে পরস্পর বিরোধী দর্শন, আইন, রাজনীতি, অর্থনীতি অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী সমাজব্যবস্থা ও জীবনদর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এ অন্ড়র্দ্বন্দ্বে কখনো অহমিকা আবার কখনো পরার্থপরতা জয়লাভ করে। যখন যে জয়লাভ করে তখন সে তার মতবাদকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। অহমিকা শক্তিশালী হয়ে নিজ মতবাদকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করলে পরার্থপরতা তখন একটা বিপরীত মতবাদ নিয়ে অহমিকার সঙ্গে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়। একইভাবে পরার্থপরতা শক্তিশালী হয়ে নিজ মতবাদকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করলে অহমিকা একটা বিপরীত মতবাদ নিয়ে পরার্থপরতার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। এভাবে পরস্পরবিরোধী মতবাদের অবিরাম দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে জড় বহির্জগতে এই অন্ড়র্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে। প্রকৃতি সব সময়ই এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করে ভারসাম্য রক্ষা করতে চায়। মানুষের ব্যক্তি জীবনের মতো সামাজিক জীবনেও মানুষের অহমিকা ও পরার্থপরতার দ্বন্দ্ব প্রায় একই রকম বাহ্য সংঘাতের সৃষ্টি করে। এভাবে অসহায় মানুষ

তার জীবনের এই অবাস্ড়ব ও অস্বাভাবিক পরিবেশের মাঝে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নিজ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় একপ্রান্ড় থেকে অন্যপ্রান্ড়ে অবিরাম দুলতে থাকে। শূন্যতাপন্থি জড়বাদ সংঘাতের বহিঃপ্রকাশ দেখে কিন্ড়ু অভ্যন্ড়রীণ বাস্ড়বতা দেখতে পায় না। তাই জড়বাদ মানুষের বস্ড়ুগত পরিবেশের দৃশ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা করে। চূড়ান্ড় বিশে- ষণে এসব বাহ্য সংঘাত শ্রেণিসংগ্রামের উৎপত্তি ঘটায়। এক শ্রেণিসংগ্রাম শেষ হতে না-হতেই আরেক শ্রেণিসংগ্রাম শুর“ হয় এবং এভাবে সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়; জীবন হয় শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর। ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, জীবন সংগ্রামে মানুষ অশেষ যন্ত্রণা ছাড়া সামান্যতম আনন্দও পায় না। ইসলাম এ সংঘাতের অবসানকল্পে আবির্ভূত হয় নি বরং ইসলাম মানুষের সত্যিকার প্রকৃতির ব্যাখ্যা দান করে এবং মানুষ ও তার প্রকৃতির মধ্যে এবং তার অহমিকা ও পরার্থপরতার মধ্যে শান্ড়ি স্থাপন করতে চায়। ইসলামের আত্মমুখী তৎপরতা এক প্রশস্ড় মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে অপরদিকে তার বৈষয়িক তৎপরতা প্রকৃতিসম্মত এক শান্ড়িপূর্ণ সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করে। এই ব্যবস্থায় মানুষ সংঘাতকে অপসারণ করে জীবন সংগ্রামকে অত্যন্ড় আনন্দদায়ক করে তোলে। পরিশেষে 'কুদরাত' এর সঙ্গে যোগসাজশে ইসলাম বুদ্ধিকে অহমিকা ও পরার্থপরতার ইচ্ছার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়। মানুষের এই মুক্তবুদ্ধি তাকে সত্যপথে পরিচালিত করে। সফেনহোরের মতে, 'যন্ত্রণার অপসারণের নামই হচ্ছে শান্ড়ি'। কিন্ড়ু ইসলামের মতে, 'যন্ত্রণার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামে আনন্দলাভ করার নাম হচ্ছে শান্ড়ি'।

ইসলামের উৎস

'দ্বীন' ও 'ইসলাম' এ দুটো শব্দ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না-থাকার কারণে প্রায়শই পবিত্র কুরআনকে ইসলামের মূল উৎস মনে করে ভুল করা হয়। পবিত্র কুরআনে 'দ্বীন' বা ধর্মকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে 'ফিতরাত' বা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রকৃতিরূপে। অপরদিকে ইসলাম হচ্ছে একটি বিজ্ঞান যার বিষয়বস্ড়ু হচ্ছে মানুষ ও মানুষের দৈনন্দিন জীবন। এটা ভাব-জগতের কল্পনাবিলাস নয়, তাই একথা বুঝার জন্যে কোনো গভীর অন্ড়র্দৃষ্টির দরকার হয় না যে, সারা সৃষ্টির মধ্যে ব্যক্ত আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছাই হচ্ছে 'দ্বীন' ও 'ইসলাম' এই উভয়ের মূল বা প্রথম উৎস। পবিত্র কুরআন হচ্ছে দ্বিতীয়। মহানবী হজরত মুহম্মদ (সা.) তৃতীয় এবং ইসলামের চার খলিফা ও রাসুল (সা.) এর বিশ্বস্ড় সাহাবাদের জীবন ও কর্মই হচ্ছে ইসলামের চতুর্থ মূল উৎস। যে সমস্ড় প্রাকৃতিক নিয়মাবলী দ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় অথচ মানুষের বুদ্ধি ও প্রচেষ্টা দ্বারা তা আবিষ্কার করা সম্ভব নয় পবিত্র কুরআনে তার মূল তত্ত্বসমূহ লিপিবদ্ধ রয়েছে। পবিত্র কুরআনকে মূলভিত্তি ধরে উন্নত বুদ্ধির সাহায্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালালে মানুষ ইসলামের আদি উৎস-প্রকৃতির রহস্যের সন্ধান লাভ করতে পারবে। আমাদের বুঝতে হবে প্রকৃতি ও পবিত্র কুরআন পরস্পরবিরোধী নয় বরং তাদের মধ্যে

রয়েছে পরিপূর্ণ ঐক্য। কোনো বস্ড়ুর সমগ্রের সঙ্গে তার একটি অংশের যে সম্পর্ক প্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র কুরআনেরও সেই সম্পর্ক। যদি প্রকৃতি ও পবিত্র কুরআনের মধ্যে কখনো বিরোধ আছে বলে প্রতীয়মান হয় তবে ধরে নিতে হবে যে, কুরআন ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান না-থাকার ফলেই এটা ঘটেছে, তাদের মধ্যে সত্যিকারের কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জানা জ্ঞানের সঙ্গে উপযোগী করে কুরআনকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা কোনো কোনো মহলে দেখা যায়। কেননা তারা মনে করেন যে, মানুষের জ্ঞান অভ্রান্ড় ও চূড়ান্ড়। এই মনোভাব আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রেরিত কিতাবের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতির যেসব নিয়মাবলী মানুষের ওপর প্রভাব বিস্ড়ার করে সেসবই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া পবিত্র কুরআন 'ফিতরাতের' স্রষ্টা 'কুদরাত' থেকে সরাসরি নাজেল হয়েছে বলে পবিত্র কুরআনকে উপযুক্তভাবে অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা করতে পারলে প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কারের পথ প্রশস্ড় হবে। অন্যদিকে প্রকৃতিকে যত্ন সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে তার দ্বারা পবিত্র কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝা ও ব্যাখ্যা করা সহজতর হবে। যখন পবিত্র কুরআন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দেবে তখন পবিত্র কুরআনকে সঠিক বলে ধরে নিয়ে মানুষের জ্ঞানকে ভুল বলে ধরে নিতে হবে। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কুরআন নিজেকে ফুলের পাপড়ির মতো উন্মোচিত করে। প্রত্যেক যুগের মর্মবাণীসমূহ সে যুগের দার্শনিক ও জ্ঞানীদের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। কিন্ড়ু পবিত্র কুরআনকে বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন মানুষের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত জ্ঞান ও যুগান্ড়কারী ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত সেই বিশেষ যুগের বাণীসমূহ।

আদর্শ মানবতার সত্যিকার প্রতিনিধি মহানবী হজরত মুহম্মদ (সা.) হচ্ছেন ইসলামের তৃতীয় উৎস। তাঁর (সা.) কাছেই পবিত্র কুরআন নাজেল হয়েছিলো এবং তাঁর (সা.) মধ্যেই দেখা যায় ইসলামি বিধিবিধানের বাস্ড়ব রূপায়ন। তাই তাঁর (সা.) জীবন ও কর্মে আমরা সত্যিকারের ইসলামকে পেয়ে থাকি। তাঁর (সা.) আদেশ, উপদেশ ও কর্মই ইসলামের তাত্ত্বিক বা নীতিগত ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দিশারি। হজরত মুহম্মদ (সা.) এর আদেশ, উপদেশ ও কর্মের লিখিত বিবরণকে 'সুন্নাহ' বলে। যদিও রাসুল (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী তাঁর (সা.) বিশ্বস্ড় সহচর (সাহাবা) দ্বারা অতি যত্নের সঙ্গে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ ও রক্ষিত হয়েছে তবু জ্ঞানপাপীদের অসৎ প্রচেষ্টার ফলে কিছু কিছু বিকৃতি হাদিসে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইসলামকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য মুনাফেক ও ইসলামের শত্র“রা বহু মিথ্যে হাদিস ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করে হাদিসগ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছে। সম্ভবত এমন দুষ্কর্মের কথা চিন্ড়া করে মহানবী হজরত মুহম্মদ (সা.) হাদিস ব্যাখ্যা করার উৎকৃষ্ট নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যদি কখনো হাদিস ও পবিত্র কুরআনের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহলে হাদিসকে মিথ্যা বা ভুল বলে পরিত্যাগ করতে হবে। রাসুল (সা.) এর কথা ও কাজই হচ্ছে 'হাদিস'। হাদিসসমূহের যেগুলো আইনের মর্যাদা লাভ করেছে সেগুলো হচ্ছে

'সুন্নাহ'। ইসলামি আইন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ হজরত মুহম্মদ (সা.) এর একনিষ্ঠ ভক্ত সাহাবিদের কথা ও কাজকেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাদিসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যাঁরা হজরত মুহম্মদ (সা.) এর সাহাবা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তাঁরাও ইসলামের বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত। তাঁরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে হজরত (সা.) এর আদেশ ও উপদেশ অনুসরণ করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। তাঁদের (রা.) জীবন ও চরিত্র হজরত (সা.) এর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং তাঁর (সা.) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছিলো। এঁদের মধ্যে হজরত আবু বকর (রা.), হজরত উমর (রা.), হজরত ওসমান (রা.), হজরত আলী (রা.) এই চার খলিফা এবং পরবর্তীকালের হজরত উমর-ইবনে আব্দুল আজিজ এই পাঁচজনকে যৌথভাবে আদর্শ হিসেবে ধরে নেয়া হয়। তাঁদের আদেশ, উপদেশ এবং কার্যকলাপ ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। খিলাফত উত্তরকালীন সময়ে ইসলামকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই তাকে ইসলামি শিক্ষার মৌলিক উৎস বলে ধরে নেওয়া হয় না।

মানবজাতি যখন তার যৌবনের কোঠায় পা দিয়েছিলো ঠিক সেই সময়েই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিলো। পবিত্র কুরআন পরিপূর্ণভাবে অবতীর্ণ হওয়ার পর ওহি নাজেল বন্ধ হয়ে যায় এবং রিসালত (নবী আগমন) পরিপূর্ণতা লাভ করে, স্থাপিত হয় ইসলামের ভিত্তি। যদিও সে সময় মানবজাতি বিবর্তনের এমন পর্যায়ে উপনীত হয় নি যাতে করে ইসলামকে সর্বজনীনভাবে তার চিন্তা ও কর্মের দিশারিরূপে গ্রহণ করতে পারে তবু ইসলামের খাঁটি ও মৌলিক উৎসগুলোর সাহায্যে মানুষ নিজের বুদ্ধি দ্বারা জীবনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম ছিলো। বলাবাহুল্য আরববাসীর সমাজজীবনে ইসলামের সত্য ও সম্ভাবনার প্রকাশ ছিলো প্রদর্শনীমূলক; এ কারণেই চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা.) এর মৃত্যুর পর ইসলামি জীবনদর্শন ধীরে ধীরে মানুষের চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে তার প্রভাব হারিয়ে ফেলে। প্রথম যুগের মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'এইভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থি উম্মত (সম্প্রদায়) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি–যাতে করে তোমরা মানবজাতির জন্যে সাক্ষ্যস্বরূপ হও এবং রাসুল (সা.) সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্যে' (২:১৪৩)**। ব্যক্তির যেমন অবয়ব আছে সমাজেরও তেমনই অবয়ব আছে। তাই ব্যক্তি জীবনের মতো সমাজ জীবনেরও জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে। যে আরব সমাজ প্রাথমিক যুগের ইসলামকে লালন করার গৌরব অর্জন করেছিলো তার জন্ম হয়েছিলো মক্কায়, বৃদ্ধি মদিনায়, ক্ষয় দামেস্কে এবং মৃত্যু আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যশালী রাজধানী বাগদাদে। এখন মানবজাতি বিবর্তনের সে পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে ইসলাম বিশ্বজনীন জীবনদর্শন হিসেবে গৃহিত হতে পারে। আমরা জানি, নকল হীরা তৈরির জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে এবং মানুষ নকল হীরা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু নকল হীরা তৈরি করা এতো ব্যয় সাপেক্ষে যে, তাকে বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করা হয় না। যখন স্বল্প

ব্যয়ে নকল হীরা তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে এবং বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন লাভজনক হবে তখন মানুষের উপকারার্থে প্রচুর পরিমাণে নকল হীরা উৎপন্ন হবে। ইসলামের ক্ষেত্রেও প্রায় একইরূপ অবস্থা বিরাজমান। আমরা জানি, মদিনার সামাজিক ব্যবস্থায় ইসলামের সত্য ও সম্ভাবনার পরিস্ফুটন ঘটেছিলো। মদিনা রাষ্ট্রের আইনকানুন ও রীতিনীতি এবং সমাজব্যবস্থায় কার্যকর পদ্ধতিসমূহের ইতিবাচক ফলাফল মানুষের পথপ্রদর্শক হিসেবে ইসলামের মূল উৎসে সুরক্ষিত আছে। পরবর্তী সময়ে আরববাসীর সমাজজীবনে যে ক্ষয় বা বিকৃতি দেখা দিয়েছে তাকে ইসলামের ক্ষয় বলে ধরে নেওয়া কোনো অবস্থায়ই যুক্তিযুক্ত নয়। ইসলামের সর্বজনীন স্বীকৃতির জন্যে মানুষের জ্ঞানের একটা বিশেষ মানে উন্নীত হওয়া প্রয়োজন। মানবজাতি এখন সেই স্তরেই অবস্থান করছে। কেননা বিবর্তনের ধারায় মানবজাতির বিবর্তন বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

খিলাফত পরবর্তী সময়ে রাজত্ব কায়েম করে এবং সাম্রাজ্য বিস্তার করে দামেস্কের উমাইয়া, বাগদাদের আব্বাসীয়, গ্রানাডার মূর, ভারতবর্ষের মোঘল ও তুরস্কের অটোম্যান রাজবংশ নিজেদের মুসলিম আখ্যা দিতেন। কিন্তু তাদের মাধ্যমে ইসলাম শাশ্বতরূপে প্রচারিত না হয়ে বিকৃতভাবে প্রচার লাভ করেছে। অর্থাৎ তারা ইসলামের সঠিক প্রতিনিধি ছিলেন না। তারা ইসলামের নামে বিশ্বের দুর্বল জাতিকে যেমন নিজ অধিকারভুক্ত করেছে তেমনই নিরীহ মানুষকে শোষণ করেছে। ফলে বিশ্ববাসী বিশেষত ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মানুষ ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হয়েছে। বর্তমান সময়ের বিশ্ব তার অতি উন্নত বুদ্ধি নিয়ে কুসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না। এসব রাজা-বাদশাগণ এবং তাদের দরবারের ধর্মযাজকেরা কিছু সংখ্যক ব্যক্তি, রাজবংশ, শ্রেণী বা জাতির স্বার্থে পৃথিবীকে শোষণ ও নির্যাতন করার জন্য অত্যন্ত গর্হিত ও অসৎ উপায়ে ইসলামকে ব্যবহার করেছেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নানাভাবে ইসলামকে বিকৃত করেছেন। ইসলামের এই বিকৃতি তারা এমনভাবেই করেছিলেন, যেমনিভাবে আমাদের চোখের সামনে মানুষের প্রয়োজনীয় ও হিতকর সকল জ্ঞানকে বিশেষ কোনো শ্রেণী, গোষ্ঠী বা জাতির স্বার্থে ব্যবহার করে মানুষের দুঃখদুর্দশাকে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। স্বাভাবিক বিবর্তনের মাধ্যমে সমগ্র মানবসমাজ তার ভাগ্যের চরমস্তরে পৌঁছে 'কুদরাত' এর সর্বশেষ সীমায় না পৌঁছা পর্যন্ত মানুষের জ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গভীরভাবে অবগত বিশ্বের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দ্বারা ইসলামের মূল উৎস থেকে কুসংস্কার মুক্ত, পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান মানব জাতিকে যুগ যুগ ধরে পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখে।

আল কুরআন

প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ গ্রন্থ। অতি উন্নত বা অতি সূক্ষ্ম (যা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শোনা যায় না) ধ্বনির মাধ্যমে ওহি বা প্রত্যাদেশের অনুভূতি লাভ করা যায়; পবিত্র কুরআনে অত্যন্ড় প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ফেরেশতা 'জিবরাঈল (আ.)' হচ্ছেন ওহির মাধ্যম এবং হৃদয় হচ্ছে এর জ্যোতিঃকেন্দ্র। তবে এর প্রথম অনুভূতি লাভ করা যায় ত্বকের দ্বারা এবং তারপর এটা হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রত্যাদেশের অভিজ্ঞতা সৃষ্টির মতোই প্রাচীন। ভারতবর্ষের ঋষীরা একে 'বাক' বা 'বেদ' বলেন; অপরদিকে ইউরোপের তাপস ও দার্শনিকরা একে প্রেরণা বলে অভিহিত করেন। এই ধ্বনিপ্রেরণার বিকাশের বিভিন্ন ধাপ আছে এবং প্রত্যাদেশ বা 'ওহি' হচ্ছে এর সর্বোচ্চ ধাপ, এই ধাপে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী সত্যি সত্যিই শোনা যায় এবং কেবলমাত্র নবী রাসুলদের ক্ষেত্রেই তা ঘটে থাকে। পবিত্র কুরআন নাজিল (প্রত্যাদিষ্ট) শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'রিসালত' (নবী বা রাসুল এর আগমন) চূড়ান্ড়রূপ লাভ করেছে এবং এর সমাপ্তি ঘটেছে। এই প্রেক্ষিতে কেউ কেউ মনে করেন আসমানি নির্দেশ লাভের বা প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ উৎস হিসেবে ধ্বনি-বোধি (ধ্বনির মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান প্রাপ্তি) চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্ড়ু এ ধারণা সঠিক নয়। উন্নত ও পবিত্র জীবনের অধিকারী বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে এমন অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকবেন। আর 'ইলহাম' হচ্ছে 'ওহি' এর চেয়ে নিম্ড়স্তরের অতিপ্রাকৃত উপায়ে লব্ধ জ্ঞান। অন্য কথায় বলা যায়, আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নবী-রাসুলদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলেছেন তিনি মানুষের সঙ্গে আর সেভাবে কথা বলবেন না; কিন্ড়ু তিনি তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায় ভিন্নভাবে প্রকাশ করে মানুষকে জ্ঞান ও নির্দেশ দিতে থাকবেন। হজরত মুহম্মদ (সা.) 'ওহি' ও 'ইলহাম' ও অন্যান্য নানা ধরনের প্রেরণাই লাভ করতেন। 'ওহি' বা প্রত্যাদিষ্ট অংশই হচ্ছে পবিত্র কুরআন; অপরদিকে 'ইলহাম' ও অন্যান্য নানা প্রকারের প্রেরণার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের সমষ্টি হচ্ছে 'হাদিস'। এসব হাদিস তথা 'ইলহামের' মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের সাহায্যে হজরত মুহম্মদ (সা.) পবিত্র কুরআনকে ব্যাখ্যা করতেন।

জন্ম থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ড় মানবজাতি 'ওহির' মাধ্যমে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ নির্দেশ লাভ করে এসেছে। মুসলমানরা শুধুমাত্র হজরত মুহম্মদ (সা.) এর রিসালতে এবং কুরআনের 'ওহি' সমূহে-ই বিশ্বাস করেন না বরং পূর্ববর্তী 'ওহি' বা প্রত্যাদেশসমূহের ওপর বিশ্বাস রাখতে তারা বাধ্য এবং পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মুসলমানদের ঈমানের একটা মূলভিত্তি। বিশ্বাসীদের পরিচয় দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে' (২:৪)**। দুর্ভাগ্যবশত পূর্ববর্তী 'ওহি'সমূহের আদি পবিত্রতা রক্ষিত হয় নি। ভুল ব্যাখ্যা দ্বারা বা অন্যায় সংযোজনের দ্বারা মানুষ তাকে বিকৃত করেছে। তবু এসবের যতোটুকু রক্ষিত আছে সেগুলো যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করে ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে অধ্যয়ন করা দরকার। পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক জাতির কাছে পয়গম্বর ও ধর্মগ্রন্থ পাঠানো হয়েছে এবং পয়গম্বরদের মধ্যে

তারতম্য করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে বর্তমানে যে অমিল দেখা যায় এর কারণ হচ্ছে, মানুষ তার নিজস্ব ধারণাকে এর মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে। পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী 'ওহি'সমূহ অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থকে অস্বীকার করে না। বরং নতুনভাবে আবিষ্কার করে সেগুলোকে পূর্ণতা দান করে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন সকল প্রকার সন্দেহ দূর করে ঘোষণা করেছে—**'আমি কোনো আয়াত রহিত করলে বা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমতুল্য কোনো আয়াত আনয়ন করি। আপনি কি জানেন না যে, আল- াহই সবকিছুর উপর সর্ব শক্তিমান' ২:১০৬)**। পবিত্র কুরআন হচ্ছে অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থসমূহের সর্বশেষ গ্রন্থ। সেহেতু মানুষের বিবর্তনের বিভিন্ন স্ড়রে প্রকাশিত সর্বজনীন ও শাশ্বত সত্য এতে স্থান লাভ করেছে তাই বলা যায়, পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী 'ওহি'সমূহের সুসংবদ্ধ এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত এক সংকলন—যাতে রয়েছে পূর্ণতা প্রাপ্ত মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের এক বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা। বর্তমানে যদিও 'ওহি' নাজেল হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে তথাপি ধ্বনির মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান অর্জনের পথ এবং সত্য উপলব্ধির অন্যান্য মাধ্যম মানুষের জন্য এখনো খোলা রয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ পথ চলার নির্দেশনা লাভ করতে পারে। এখন থেকে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুসরণ করে অতি উন্নত বুদ্ধি এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞান মিলিতভাবে জীবনকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করবে এবং মানবজাতিকে সত্য পথে চালিত করতে পারবে। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই যেহেতু কুরআনের আদি পবিত্রতা রক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছেন তাই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য নতুন কোনো 'ওহি'র প্রয়োজন হবে না বরং পবিত্র কুরআনই যুগ যুগ ধরে প্রগতির শিখা চির অম- ান ও উজ্জ্বল রাখবে। পবিত্র কুরআন বা হজরত মুহম্মদ (সা.) এমন কোনো নতুন মতবাদ প্রচার করেন নি কিংবা এমন কোনো কিছু প্রবর্তন করেন নি যা পূর্বে কাউকেই অবহিত করা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হজরত মুহম্মদ (সা.) এর শিক্ষা হচ্ছে সেই সবেরই স্বীকৃতি যা কিছু পূর্ববর্তীদের ওপর নাজেল বা অবতীর্ণ হয়েছিলো। এ বিষয়ে কুরআনের ঘোষণা অত্যন্ড় স্পষ্ট। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে—**'আল কুরআন আল- াহ ব্যতীত আর কারো রচনা নয়। পক্ষান্ড়রে সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্বে যা কিছু নাজেল হয়েছে কুরআন হচ্ছে সেসবের সত্যতার স্বীকৃতি ও বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইহা জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ' (১০: ৩৭)**। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এভাবে বলার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন—**'বলুন, আমিতো কোনো নতুন রাসুল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহি করা হয়। আমিতো এক স্পষ্ট সতর্ককারী বৈ কিছু নই.' (৪৬:৯)**। দুনিয়ার সব ধর্মগ্রন্থে ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে যে, পূর্ববর্তী সকল লুপ্ত 'ওহি'সমূহকে পুনর"দ্ধার, অনুমোদন এবং সংকলন করার জন্য একজন মহাপুর"ষ বা রাসুলের আবির্ভাব ঘটবে। সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থে একে বলা হয়েছে 'বেদ উদ্ধার' বা লুপ্ত প্রত্যাদেশের পুনর"দ্ধার। তবে এটা অত্যন্ড় দুঃখজনক যে, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের

অনুসারীরা পবিত্র কুরআন ও হজরত মুহম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবের মাধ্যমে এই ভবিষ্যৎবাণী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে বলে স্বীকার করেন না। বরং এখনো তারা তাদের ধর্মগ্রন্থে উলে- খিত পয়গম্বর বা মহাপুর ষের আবির্ভাবের অপেক্ষায় আশায় বুক বেঁধে আছেন। মানুষের এই অনমনীয় মনোভাব তার অহমিকা ও দাম্ভিকতা থেকেই সৃষ্ট এবং এই অহমিকা ও দাম্ভিকতা তার প্রকৃতিপ্রদত্ত। মুসলমানরাও এ ত্র টি থেকে মুক্ত নন। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রত্যেক শতাব্দীতে এমন একজন 'মুজাদ্দিদ' বা সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে যিনি 'ইলহাম' এর সাহায্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার মধ্যে যে ভেজাল ও বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে তা দূরীভূত করেন। কিন্ডু যখন এরূপ কোনো মুজাদ্দিদের আবির্ভাব ঘটে তখন কিছু সংখ্যক লোক ব্যতীত প্রায় সকলেই তাকে প্রত্যাখ্যান করেন বা 'কাফের' বলে আখ্যায়িত করেন। পবিত্র কুরআনে মানুষের অভ্যাসগত এই বিদ্রোহী মনোভাবের সুন্দর বর্ণনা দেওয়া আছে বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে। এমন অনেক আয়াতের মধ্যে দু'টি আয়াত উলে- খ করা যাচ্ছে। একটি হচ্ছে—**'তারা দৃঢ়তার সঙ্গে শপথ করে বলতো, তাদের কাছে কোনো সতর্কবাণী আসলে তারা অন্য যেকোনো সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সৎ পথে চলবে। অতঃপর যখন তাদের কাছে সতর্কবাণী আসলো, তখন তাদের ঘৃণাই কেবল বেড়ে গেলো' (৩৫:৪২)** এবং অন্যটি হচ্ছে—**'এমনইভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোনো রাসুল আগমন করেছেন, তারা তাঁকে বলেছে: তুমিতো এক জাদুকর না হয় উন্মাদ। তারা কি একে অপরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে? বস্‌ডুত তারা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়' (৫১:৫২-৫৩)**।

আল কুরআন তেইশ বছর সময় ধরে অবতীর্ণ হয়েছিলো। কখনো একটি আয়াত, কখনো একত্রে কয়েকটি আয়াত আর কখনোবা পূর্ণ একটি সুরা এক সঙ্গে নাজেল হতো। এক শ্রেণীর মুসলমান এবং অমুসলমান প িতদের মধ্যে সাধারণভাবে একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে, তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানই (রা.) কুরআন সংকলন করেছেন। কিন্ডু এটা আদৌ সত্য নয়। বরং প্রকৃত ঘটনা এই যে, হজরত ওসমানের (রা.) খিলাফতকালীন সময়ে রাজ্যের বহুস্থানে পবিত্র কুরআনের বহু প্রতিলিপি প্রচলিত ছিলো। এই সব প্রতিলিপির বিশুদ্ধতা ও মৌলিকত্ব সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিতে পারে এই আশংকায় হজরত ওসমান (রা.) সকল প্রতিলিপিকে সংগ্রহ করে মূল কুরআনের সঙ্গে মিলিয়ে এগুলোর বিশুদ্ধতা ও মৌলিকত্ব পরীক্ষা করেন এবং পরে কিছু সংখ্যক প্রামাণ্য ও বিশুদ্ধ প্রতিলিপি তৈরি করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বণ্টন করেন। আর এ কারণেই হজরত ওসমান (রা.) 'জামিউল কুরআন' বা কুরআনের সংকলক উপাধি লাভ করেছিলেন। তবে বর্তমানে পবিত্র কুরআন যেভাবে বিভিন্ন পরিচ্ছদে সাজানো আছে এমনকি বিরাম চিহ্ন ও বিভিন্ন সংকেত যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার সবকিছুই মহানবী হজরত মুহম্মদ (সা.) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে করা হয়েছিলো। হজরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং হজরত জায়েদ (রা.) এ দু'জন মূল কুরআনের আদি লিপিকার। তাঁরা এমন বিশ্বস্‌ডতার সঙ্গে এ কাজ করেছেন যে, এ ব্যাপারে কোনো ব্যক্তিরই কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়াও 'ওহি'সমূহ এবং 'ওহি' নাজেলের পর্যায়ক্রম এমন বিশ্বস্‌ডতার সঙ্গে লিপিকারগণ লিপিবদ্ধ

করেছেন যে, আজও কুরআন সম্পর্কে বিজ্ঞ প িতগণ নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন কোন্ আয়াত কোন্ সময়ে কোথায় নাজেল হয়েছিলো। চৌদ্দশ' বছর পূর্বে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনকে রক্ষার জন্যে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা আজও অটুট রয়েছে। অপরদিকে বিশ্ব সভ্যতা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যখন এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় যে, ভবিষ্যতেও এর মধ্যে আর কোনো ধরনের বিকৃতি সম্ভবপর নয়।

পবিত্র কুরআনের বাণী যাতে সহজ সরলভাবে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করা যায় সেজন্যে কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও বিধিবিধানের সঙ্গে বারবার উপমা, রূপক ও উপদেশমূলক গল্পের উলে- খ করা হয়েছে এবং এদের সঙ্গে ইতিহাস ও প্রকৃতির সম্পর্ক কী তা দেখানো হয়েছে। সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যে মানুষের পক্ষে পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্‌ডু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নয় এমন ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। **'আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে; অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?' (৫৪:১৭)** পবিত্র কুরআনের উৎসাহ উদ্দীপক এই বাণী মানুষের ভুল দূর করতে যথেষ্ট। পবিত্র কুরআন নাজেল হয়েছে মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে। তাই মানুষ যাতে পবিত্র কুরআন পড়ে তাকে ভালোভাবে বুঝতে পারে সেজন্যে কুরআনের ভাষাকে সংক্ষিপ্ত না করে সহজবোধ্য করা হয়েছে। এটা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অপার মহিমা।

পবিত্র কুরআনের ব্যবহারিক ও কার্যকরী দিককে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে– একটি দিক হচ্ছে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি কর্তব্য এবং অন্যটি হচ্ছে মানুষের প্রতি কর্তব্য। আরবি ভাষায় এই দু'ভাগের নাম হচ্ছে যথাক্রমে 'হক্কুল- াহ' ও 'হক্কুল এবাদ'। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি কর্তব্য হচ্ছে একান্‌ডভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার অপরদিকে মানুষের প্রতি কর্তব্য হচ্ছে সামাজিক দায়িত্বের বিষয়, এটাই হচ্ছে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা। পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য এই যে, মানুষের প্রতি কর্তব্যকে অবহেলা করে বা সঠিকভাবে পালন না করে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি কর্তব্য পালন করতে গেলে পবিত্র কুরআন এ কাজকে অবৈধ বা নিস্ফল বলে ঘোষণা করে। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে। সে সেই ব্যক্তি, যে এতিমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। অতএব দুর্ভাগ্য সেসব নামাজিদের যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন, যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে এবং নিত্য ব্যবহার্য গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সাহায্য দানে বিরত থাকে' (১০৭ : ১-৭)**। মানুষের জন্যে এটা দুঃখজনক ব্যাপার যে, ইসলামের এই মানবিক দিক আমরা সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছি। আর এ কারণেই পৃথিবীতে বর্তমানে অনেক তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্র ও জাতি থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের কোথাও আমরা একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ খুঁজে পাই না। সিনাই পর্বতের দশ নির্দেশ, গৌতম বুদ্ধের অষ্টমার্গ অথবা ভারতীয় দর্শনের তিন 'দ' যথা- 'দান'[১], 'দময়ত'[২] এবং 'দয়দ্ধম'[৩] যেভাবে প্রত্যেক সভ্য সমাজের ভিত্তি হতে পারে ঠিক সেভাবেই পবিত্র কুরআনের সহজ, স্বাভাবিক ও নির্ভুল সামাজিক রীতিনীতি ও নিয়মকানুনগুলোও, শান্‌ড় ও প্রগতির নিশ্চয়তা দিতে পারে এমন

যে কোনো সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে অবশ্যই গৃহিত হতে পারে। শূন্যতাবাদের প ি তজনেরা জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক এদের সবকিছুকেই স্বীকার করেন। কোনো বস্ড়ুর গতি যতো বিপরীতমুখীই হোক না কেন পৃথিবী যেমন তাকে তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে ঠিক তেমনই, সত্য সব সময়ই সত্য থাকে।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্ড়ুকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এর প্রথমটি হচ্ছে ন্যূনতম বা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আদর্শগত বা চরম প্রয়োজন। মানুষের বিবর্তন বা বিকাশের যে স ড়রে আল কুরআন নাজেল হয়েছে, সে সময় ন্যূনতম প্রয়োজন সকলের জন্যেই ছিলো বাধ্যতামূলক আর আদর্শগত প্রয়োজন; কেবলমাত্র রাসুল (সা.) এর জন্যে ছিলো বাধ্যতামূলক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মজুতদারি বা সমাজের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজের উদ্দেশ্যে না রেখে ব্যক্তিগত যৎসামান্য সঞ্চয় জনসাধারণের জন্যে বৈধ ছিলো কিন্ড়ু রাসুল (সা.) এর জন্যে এ কাজটি ছিলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে— **'তারা অভিশপ্ত যারা অর্থ সঞ্চয় করে ও বারবার গণনা করে এবং মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সঙ্গেই থাকবে' (১০৪:২)**। মুসলিম সামাজিক বিধানকে এখন কুরআনের বিষয়বস্ড়ুর দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ আদর্শের তথা চরম প্রয়োজনের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে কেননা মানুষ বর্তমানে বিবর্তনের এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যখন এসব বিধানের কিছু কিছু অংশ সকলের জন্যে বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে বা অন্য কোনো গোপন উদ্দেশ্যে কেউ যদি একথা বলে যে, ইসলাম নমনীয় ও গতিশীল নয় বরং কঠিন ও স্থবির তাহলে ইহা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামের ন্যূনতম ও চরম কার্যক্রমের মধ্যে ব্যবধান এতো বিশাল ও বিস্তৃত যে, অনন্ড়কাল পর্যন্ড় মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রগতির ধারাকে তার সীমার মধ্যে স্থান দিতে পারে অর্থাৎ মানুষের বিবর্তনের চরম সীমা পর্যন্ড় তা প্রসারিত। এক কথায় বলা যায় ইসলামের মানবিক দিক ধর্মতত্ত্ব, নীতিকথা, প্রথা বা আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব নয় বরং তা হচ্ছে তৌহিদপন্থি বস্ড়ুবাদ।

---

১. দান— অতিশয় দানশীলতা; ২. দময়ত— আত্মসংযম; ৩. দয়দ্ধম— কর ণা

কুরআন অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যেন সে প্রকৃতির রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। উপনিষদে মানুষকে 'শোন, হে অমৃতের সন্ড়ানগণ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মানুষ সৃষ্ট জগতের কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ। তাকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টির বাকি সবকিছু আবর্তিত হয়। বস্ড়ু-জগৎকে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে বস্ড়ুগত পরিবেশের প্রভাবকে উপেক্ষা করা মানুষের অস্ড়িত্বের জন্যে এবং প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর। মানবজীবনের এই দিক সম্পর্কে মানুষের চিন্ড়া ও কর্মের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন পূর্ণাঙ্গ দিশারি। সুতরাং পবিত্র কুরআন পাঠের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে করে এ পবিত্র গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে মানুষ ইহজগতে ও পরজগতে সুখী হওয়ার জন্যে বাস্ড়ব জ্ঞানলাভ করতে পারে। দুঃখকষ্টের অনুপস্থিতিকে সুখ বলা যায় না বরং জীবনসংগ্রামের আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করার নামই হচ্ছে সত্যিকারের সুখ। আনন্দের এই চেতনাই কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থকে একথা লিখতে প্রেরণা জুগিয়েছিলো:

"The birds around me hopped and played,
Their thoughts I cannot measure;
But the least motion which they made
It seemed a thrill of pleasure."
(অর্থাৎ আমার চারদিকে যেসব পাখি নাচে আর খেলা করে
আমি তাদের মনের কথা বুঝি না;
কিন্ড়ু তাদের সামান্যতম অঙ্গ সঞ্চালনই
আমার মনে আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে তুলে)।

পবিত্র কুরআনের মানবিক মূল্যবোধকে ভুলে যাওয়ার ফলে পার্থিব জীবনে কোনো উপকার পাওয়ার জন্যে আজকাল তা পড়া হয় না; বরং এখন তা পড়া হয় বেহেশতের বাগানে এক কাল্পনিক সুখী জীবন লাভের জন্যে। কিন্ড়ু মনে রাখা উচিত বেহেশত ও দোজখ কোনো স্থান বিশেষের নাম নয়। এগুলো হলো মৃত্যুহীন জীবনের উন্নতি বা অবনতির এক একটা বিশেষ বিশেষ অবস্থা বা স ড়র। এগুলো স্থান কালের রহস্যে আবৃত বস্ড়ু-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন না-ও হতে পারে। তবে বেহেশত ও দোজখের এবং স্থানকালের যুগপৎ অবস্থানের কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। পবিত্র কুরআনে বেহেশত ও দোজখকে উপমা ও রূপক হিসেবে পার্থিব আনন্দের সঙ্গে তুলনা করে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বেহেশত ও দোজখের প্রকৃতি সম্পর্কে কাল্পনিক চিন্ড়ার যেমন কোনো প্রয়োজন নেই, তেমনই উপকারিতাও নেই। তবে বেহেশত ও দোজখ সম্পর্কে বিস্ময়কর উপমা ও রূপক দেওয়ার এটাই হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য যে, ইহজীবনের সঙ্গে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে এবং বর্তমানের দ্বারাই সবসময় ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হয়। পক্ষপাতদৃষ্ট মন নিয়ে ও হালকাভাবে পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের ফলে ইসলামের সমালোচকেরা একথা বলেন যে, দ্য ক্রিড অভ্ ইসলাম ◆ ৪৪ বেহেশতের কথা বলা হয়েছে তা অত্যন্ড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ বা কামনা লালসায় ভরপুর। 'আমাদের বর্তমান দ্বারাই ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হয়'—এটা যুক্তির কথা এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাই এর সাক্ষ্য বহন করে। উলে- খিত বাক্যের ওপর বিশ্বাস মানুষের মনে দায়িত্ব বোধের সৃষ্টি করে, যা শান্ড়িপূর্ণ জীবনের জন্য অপরিহার্য। ভবিষ্যৎ সুখের আশা সংগ্রামরত মানুষের জীবনে শক্তি ও প্রেরণার চিরন্ড়ন উৎস হিসেবে কাজ করে। ইহজীবন যদি সুন্দর হয় তবে পরজীবনও সুন্দর হবে, একইভাবে ইহজীবন যদি কুৎসিত হয় তাহলে পরজীবনও সমান কুৎসিত হবে। সুতরাং এই জড়জগতে আমাদের ভাগ্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্যে উপযুক্ত

জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ পবিত্র গ্রন্থ থেকে কীভাবে পেতে পারি সে উদ্দেশ্য নিয়েই পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করা উচিত। আমরা যদি এ কাজে সফলতা লাভ করতে পারি তাহলে ভবিষ্যৎ সুখের জন্যে আমাদের ভাবতে হবে না।

বর্তমানে যে রীতিতে পবিত্র কুরআন পড়া হয় সে রীতিতেও আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এখন অনেক লোকই তোতা পাখির মতো পবিত্র কুরআন পড়েন এবং একটি লাইনও গুর"ত্ব সহকারে বুঝার চেষ্টা না করে তা মুখস্থ করেন। একইভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বিষয়বস্ড়ুর সহজ অর্থকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে প্রত্যেক শব্দের মধ্যে রহস্য খোঁজাকেই গভীরতম জ্ঞানের কাজ বলে বিবেচনা করেন। পবিত্র কুরআন পাঠের এই ভ্রান্ড় নীতিই হচ্ছে এই মহাগ্রন্থের বাস্ড়ব মূল্যবোধ সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞানতার প্রধান কারণ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পবিত্র কুরআনের বাণী যথাযথভাবে বুঝার ও আত্মীকরণ করার জন্যে আরবি ভাষা জানা এবং আরবি সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ড় আবশ্যক। কিন্ড়ু দৈনন্দিন জীবনের নিয়মিত কাজ কর্মের নির্দেশ লাভের জন্যে যে পরিমাণ জ্ঞান আবশ্যক তা জানতে হলে আরবি ভাষা জানা অপরিহার্য নয়। কেননা পৃথিবীর প্রায় সবগুলো ভাষায়ই পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ছাপা হয়েছে এবং আলোচিত হয়েছে। পবিত্র কুরআন যেহেতু পড়া যায় এবং মুখস্থ করা যায় তখন ইচ্ছা করলে এর সহজ অর্থও পড়া ও মুখস্থ করা খুব কষ্টসাধ্য হবে না।

পবিত্র কুরআন পাঠের পদ্ধতি অবশ্যই পক্ষপাতহীন, সংস্কারমুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়া উচিত। পূর্ব থেকে কল্পিত কোনো ধারণা নিয়ে তা পাঠ করা উচিত নয়। প্রত্যেক আয়াত বা বাক্য পড়ার সময় তার প্রসঙ্গের প্রতি এবং ঠিক তার আগের ও পরের বাক্যের সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। একই সঙ্গে পঠিত বাক্য বা আয়াতের আগের ও পরের আয়াতসমূহের সঙ্গে এর পর্যায়ক্রমের তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে হবে। মোটকথা পবিত্র কুরআন পড়ার সময় প্রত্যেকটি সুরা বা সুরার অংশ বা আয়াতের প্রসঙ্গ ও পর্যায়ক্রমের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা পড়া উচিত। মনে রাখতে হবে পবিত্র কুরআন সম্পর্কহীন বিভিন্ন অংশের সমষ্টি নয় বরং তা হচ্ছে এক অখ" সমগ্র। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে পবিত্র কুরআনের সামগ্রিক রূপের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি আয়াত, প্রতিটি সুরা ও প্রতিটি পারা অধ্যয়ন করা। একটা বিশেষ ভাবকে বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষ একটা শব্দ কেন বা কী কারণে ব্যবহার করা হয়েছে তা সতর্কতার সঙ্গে নিরূপণ করতে হবে। বিশেষত, এক এক ক্ষেত্রে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এক একটা বিশেষ গুণবাচক (সিফাত) নাম ব্যবহার করার তাৎপর্য কী তার ওপর খুব বেশি গুর"ত্ব দিতে হবে।

পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের মধ্যে কতকগুলো হচ্ছে মৌলিক আর কতকগুলো রূপক। বিভ্রান্ড়ি ও ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে—**'তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক' (৩:৭)**। উপমা, রূপক, অলংকার ইত্যাদির প্রতি যথার্থ দৃষ্টি রেখে এবং সর্বত্র রহস্যের সন্ধান না করে প্রত্যেক শব্দের সহজ ও সরল অর্থ গ্রহণ করেই পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করা উচিত। প্রকৃতির রহস্য যেমন সবার পক্ষে সব অবস্থায় বুঝা সম্ভবপর নয় তেমনই মানব জাতির বিকাশের বিশেষ স্ড়রে পবিত্র কুরআনের অর্থকে সঠিকভাবে অনুধাবন করাও সবার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে 'ফিতরাত' যেমন অজানা কিছু নয় পবিত্র কুরআনও ঠিক তেমনই অজানা কিছু নয় বরং একে জানা সহজতর।

পবিত্র কুরআনকে আরোহ (বিশেষের ক্ষেত্রে প্রকাশিত সত্যতাকে সার্বিকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ) ও অবরোহ (সার্বিকের ক্ষেত্রে প্রকাশিত সত্যতাকে বিশেষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ) এ উভয় পদ্ধতিতে অধ্যয়ন করা উচিত। পবিত্র কুরআন থেকে নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ করে যেমন প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা বিশে- ষণ করতে হবে ঠিক তেমনই প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত জ্ঞানের আলোকে ও প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনকে ব্যাখ্যা করতে হবে। পবিত্র কুরআনের বক্তব্যকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং বহিঃইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা এ উভয়েরই সমানভাবে উন্নতির প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনের জ্ঞানই সর্বোচ্চ জ্ঞান এবং এ জ্ঞান অর্জন করার পূর্বশর্ত হচ্ছে শান্ড় পরিবেশ, বিশ্বাসের গভীরতা এবং চিত্তের ঐকান্ড়িক একাগ্রতা। তাইতো পবিত্র কুরআনে মহানবীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে—**'হে বস্ত্রাবৃত, রাত্রিতে দ"য়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে, অর্ধ রাত্রি বা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা তদপেক্ষা বেশি এবং কুরআন আবৃত্তি কর"ন সুবিন্যস্ড়ভাবে ও স্পষ্টভাবে, আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুর"ত্বপূর্ণ বাণী। নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল' (৭৩:১-৬)**।

কলেমা

কলেমা বা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্ব এবং হজরত মুহম্মদ (সা.) এর রিসালতে বিশ্বাস ইসলামের মূলভিত্তি। মানুষের চিন্ড়া, অনুভূতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে ইসলাম এক বিরাট বিপ- বের সৃষ্টি করেছিলো। মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে এই বিপ- ব আরব সভ্যতা নামে পরিচিত। এই বিপ- বের যাবতীয় শক্তিই নিহিত ছিলো এই কলেমার মধ্যে।

'লা ইলাহা ইল- াল- াহু মুহাম্মদ রাসুলুল- াহ' এই কলিমার বাংলা হচ্ছে 'নেই কোনো উপাস্য, আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যতীত এবং হজরত মুহম্মদ (সা.) আল- াহ'র রাসুল'। এ কলেমার প্রথমেই 'লা ইলাহা' (অর্থ হচ্ছে নেই কোনো উপাস্য) শব্দ দ্বারা সকল প্রকারের উপাস্যকে অর্থাৎ বহু ঈশ্বরবাদকে অস্বীকার করা হয়েছে, একইভাবে ইল- াল- াহু (আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যতীত) শব্দ দ্বারা নাস্ড়িকতাকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল- াহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্বকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে মুহম্মদ (সা.) এর রিসালতের প্রতিও সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, কলেমা বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের অখ"তা সম্বন্ধে মানুষকে

জ্ঞানদান করে এবং প্রত্যাদেশ বা 'ওহি' যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উৎস সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে মানুষকে শিক্ষা দেয়। কলেমাতে যে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি অন্ধ জাগতিক শক্তি, অচেতন আদি কারণ বা জীবনী শক্তির জড় উৎস নন। তিনি হচ্ছেন বিশ্বের জীবন্ড় ও সচেতন স্রষ্টা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকারী। পবিত্র কুরআনে কয়েকটি ছোট আয়াতের মাধ্যমে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর ওপর বিশ্বাসের পবিত্রতা সম্পর্কে বলা হয়েছে— **'বলুন, তিনি আল- াহ, এক-অদ্বিতীয়, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয় নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই' (১১২:১-৪)**। আরো বলা হয়েছে—**'সকল প্রশংসা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা, যিনি দয়াময় ও পরম দয়ালু, যিনি কর্মফল দিবসের মালিক।' (১:১-৩)**।

কলেমায় বিশ্বাসের অর্থ কোনো অনিশ্চিত দেব-দেবতায় বিশ্বাস নয়; এর অর্থ এমন এক জীবন্ড় ও সচেতন স্রষ্টার বিশ্বাস - যাকে প্রকৃতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যায়। দৈনন্দিন জীবনের কর্মকান্ডে এ বিশ্বাসের বাস্ড়ব মূল্য রয়েছে। ইসলাম অথবা অন্য কোনো জীবনদর্শনে কর্মহীন বিশ্বাস বা বিশ্বাসহীন কর্মের কোনো স্থান নেই। সুতরাং কলেমায় বিশ্বাসের সত্যিকার অর্থ হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কলেমার শিক্ষার যথার্থ রূপায়ন। আমরা জানি, ইসলামকে অবতীর্ণ করা হয়েছে তিমিরাচ্ছন্ন আরব জাতির নিকট। কেননা অতি উন্নত সামাজিক অবস্থাসম্পন্ন কোনো সমাজকে বা প্রগতিশীল জাতিকে বেছে নিয়ে তাদেরকে ইসলামের প্রয়োগ ক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করলে ইসলামের সত্য, সৌন্দর্য ও বাস্ড়ব ক্ষেত্রে তার মূল্য এতো সহজে অনুধাবন করা যেতো না। প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে এই যে, স্বল্প মূল্যের ধাতু সিসার ওপর হীরাকে স্থাপন করলে হীরার উজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। কার্ল মার্ক্সের হিসেব অনুসারে তার দর্শনের বাস্ড়ব প্রয়োগের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিলো ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত দেশ। কেননা সেখানে সুসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী ছিলো। কিন্ড়ু এ ক্ষেত্রে তার প্রত্যাশার বিপরীত চিত্রই বাস্ড়বায়িত হলো। রাশিয়ার মতো শিল্পে অনুন্নত দেশই অর্জন করলো মার্কসবাদকে জীবন্ড়রূপে বিশ্বের সামনে প্রকাশ করার কৃতিত্ব।

কলেমার শিক্ষা অর্থাৎ রীতিনীতি মানুষের জীবনের বাস্ড়ব ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে আরব সমাজ এক মহৎ ও সর্বসুন্দর জাতিতে পরিণত হয়েছিলো। আবার এই বিশ্বাস যখন তাদের বাস্ড়ব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শুধু মৌখিক স্বীকৃতিতে পরিণত হলো তখন তারা যে অন্ধকারে ছিলো সে অন্ধকার জীবনেই ফিরে গেলো। পৃথিবীতে মুসলিম জাতিসমূহকেই শুধু আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মনোনীত জাতি বলা চলে না। তাঁর অপরিবর্তনীয় ও নিরপেক্ষ আইনসমূহ শুধু মুসলিম জাতি নয় অন্যান্য জাতির জন্যেও সমানভাবে কার্যকর। তাই আরব মুসলিমরা যতোদিন পর্যন্ড় তাদের বিশ্বাস ও কর্মের পবিত্রতা রক্ষা করে চলে ছিলেন ততোদিন পর্যন্ড় তারা ছিলেন মহান জাতি।

বাগদাদের আব্বাসীয় সুলতানগণ, তাদের সামন্ড়গণ এবং সেখানকার অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকজন কলেমার সার্বভৌম প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর

স্বার্থান্বেষী উলামাদের নিযুক্ত করেন। এসব স্বার্থান্বেষী উলামা বা পন্ডিতেরা সুযোগ-সুবিধা লাভের বিনিময়ে কলেমার বিকৃত ব্যাখ্যাসহ ইসলামবিরোধী কাজের পক্ষে ফতোয়া তৈরি করতে সর্বদা প্রস্ড়ুত থাকতেন। এমনকি তারা কলেমার এক নতুন আরবি ভাষ্যও তৈরি করেন। এ ভাষ্যটি ছিলো-'লা মাবুদা ইল- াল- াহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল- াহ'। অর্থাৎ আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কেউ নেই, মুহম্মদ (সা.) তাঁর রাসুল'। কলেমার নতুন ভাষ্য তৈরি করে ইসলামকে নিছক উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হলো এবং জীবনকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এ দু'টি অংশে বিভক্ত করা হলো। একই সঙ্গে কালবিলম্ব না করে পার্থিব জীবনের ও আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য পৃথক পৃথক প্রভু বা অভিভাবক সৃষ্টি করা হলো। নিজেদের রাসুল (সা.) এর প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে উলামারা হলেন আধ্যাত্মিক জীবনের অভিভাবক বা প্রভু আর সুলতান বা শাসকরা হলেন পার্থিব জীবনের অভিভাবক বা প্রভু। এসব পার্থিব ও আধ্যাত্মিক অভিভাবকেরা একে অপরের পূর্ণ সহযোগিতায় জনগণকে শোষণ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। পরকালীন আরাম আয়েশের জন্যে আধ্যাত্মিক অভিভাবকদের প্রতি আনুগত্য এবং ইহকালীন আরাম আয়েশের জন্যে পার্থিব অভিভাবকদের প্রতি আনুগত্য প্রচলিত নিয়মে পরিণত হলো। রাসুল (সা.)এর একটি হাদিস হচ্ছে—**'শাসকেরা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ছায়া'**। এর অর্থ হচ্ছে, আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেভাবে তাঁর সৃষ্ট জীবকে পালন করেন শাসন কর্তাদেরও উচিত ঠিক সেভাবে তার প্রজাসাধারণকে প্রতিপালন করা। স্বার্থান্বেষী উলামারা এই হাদিসটিরও বিকৃত ব্যাখ্যা করে সুলতান বা রাজার শাসন ক্ষমতা 'ঐশি শক্তির অধিকারী' বা 'আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত' এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ধর্ম সম্বন্ধে এই অভিনব ও অনৈসলামিক ধারণা জড়বাদী ইউরোপে প্রসার লাভ করেছিলো আর এই ধারণাই সেখানে ধর্মকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে।

হজরত মুহম্মদ (সা.) এর রিসালত কলেমার মূল বক্তব্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্বে এবং আল কুরআনের অলৌকিকত্বের প্রতি বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে এর প্রয়োজন ছিলো। মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে বীরদের গুণকীর্তন করা এমনকি তাদের পূজা করা। বহু ঈশ্বরবাদের প্রভাবে মানুষের মধ্যে তা আরো দৃঢ় হয়েছে। মানুষের এই সহজাত স্বভাবই বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা নষ্ট করা এবং পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশগুলোর মূল বক্তব্যকে বিকৃত করার জন্যে প্রধানত দায়ি। এভাবেই যিশুখ্রিস্টের অতিভক্ত শিষ্যরা তাঁর প্রতি ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছিলো। খ্রিস্টান জনগণ যিশুখ্রিস্টকে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পুত্র বলে অভিহিত করে বিশুদ্ধ ক্রিস্ট ধর্মের একেশ্বরবাদ থেকে সৃষ্টি করেছে ত্রিত্ববাদ। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণেরা তাদের গুরুদেবকে ঈশ্বরের অবতার বলে বর্ণনা করতেন। এভাবেই তারা বৈদিক ধর্মের একেশ্বরবাদকে বিসর্জন দিয়ে প্রবর্তন করেন মূর্তি পূজা প্রথা। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোনোভাবেই যাতে হজরত মুহম্মদ (সা.) এর অনুসারীরা তাদের রাসুলের (সা.) প্রতি অন্ধ ভক্তির কারণে যিশু খ্রিস্টকে যেভাবে তার অনুসারীরা দেবতায় পরিণত করেছে সেই

রকম ভুল না করেন, সে জন্য হজরত মুহম্মদ (সা.) যে স্রষ্টা নন কিংবা স্রষ্টার সত্তার সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত নন একথা কলেমার মধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে হজরত মুহম্মদ (সা.)কে একথা বলতে এভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—**'বলুন, আমিও তোমাদের মতোই মানুষ, আমার প্রতি ওহি হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল- াহ' (৪১:৬)**। আরো বলা হয়েছে—**'আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো, যদি তোমাদের জানা না থাকে' (১৬:৪৩)**। বস্ড়ুত সকল নবী ও রাসুলই মানুষ ছিলেন। তবে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য এই যে, তাঁরা 'ওহি' লাভ করতেন। হজরত মুহম্মদ (সা.) এর রিসালতে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওহিসমূহে এবং পবিত্র কুরআনের অলৌকিক উৎপত্তির ওপরও বিশ্বাস বোঝায়। কলেমার মূল বক্তব্যে হজরত মুহম্মদ (সা.) এর রিসালতের উলে- খ আমাদেরকে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, রাসুল ও পবিত্র কুরআন, ইসলামের এই প্রধান তিন উৎসকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছে। যদি তা না হতো তাহলে ইসলামের মূল উৎসগুলোর বিশুদ্ধতা, বিধিবিধান, দৃষ্টান্ড়সমূহ ও আদর্শের অবস্থা দাঁড়াতো পূর্ববর্তী 'ওহি'সমূহেরই মতো।

নাবিকের দিকদর্শন যন্ত্র যেমন জাহাজকে ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও তার গন্ড়ব্যস্থলে নিয়ে যায়; তেমনই কলেমার শিক্ষা মানুষকে উন্নতি থেকে অধিকতর উন্নতি, সাফল্য থেকে অধিকতর সাফল্যের মাধ্যমে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম। যদি কলেমাকে আমাদের চিন্ড়া ও কর্মের দিশারিরূপে গ্রহণ করে কলেমার শিক্ষাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে বাস্ড়বায়িত করা হয় তাহলে অতীতের মতো বর্তমানেও কলেমা মানুষকে প্রগতি ও সাফল্যের পথে উত্তরোত্তর এগিয়ে নিতে পারে। ইতিহাস সাক্ষী, যে সময়ে হজরত মুহম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময়ে তাঁর (সা.) নিজ জাতি আরববাসী নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সমাজজীবনের সকল দিক থেকেই অত্যন্ড় নিকৃষ্ট জাতি ছিলো, সে সময়ের যতো সভ্য মানুষ ছিলো তাদের মধ্যে আরববাসীই ছিলো নিকৃষ্টতম। রাসুলুল- াহ (সা.) মাত্র তেষট্টি বছর জীবিত ছিলেন। আমরা জানি তিনি (সা.) চলি- শ বছর বয়সে ওহি লাভ করেছেন। সেই হিসেবে তাঁর (সা.) পয়গম্বরী জীবনের কর্মকাল মাত্র তেইশ বছর। এই তেইশ বছর সময়ই তিনি তাঁর (সা.) ওপর নাজেল হওয়া ওহি প্রচার করেছেন এবং এর বাস্ড়বায়নের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তাঁর (সা.) প্রচেষ্টায় মর ভূমির যাযাবর আরববাসী, যারা কয়েক বছর পূর্বেও ছিলো খুব নিম্ন শ্রেণীর মানুষ, তারাই হজরত মুহম্মদ (সা.) এর মৃত্যুর সময় নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক থেকেই পরিণত হয়েছিলো সর্বোৎকৃষ্ট মানুষে। তাঁরই (সা.) শিক্ষার প্রভাবে নিরক্ষর আরববাসী পরিণত হয়েছিলো তৎকালীন শিক্ষিত মানুষের শিক্ষা গুর তে। এরই প্রভাবে অমার্জিত ও কুর চিসম্পন্ন আরব জাতি, যারা মদ্যপান, লাম্পট্য, জুয়া খেলাসহ বিভিন্ন ধরনের নৈতিক ও মানসিক বিকৃতিতে আনন্দ লাভ করতো তারাই পৃথিবীকে শেখালো সবরকমের সাংস্কৃতিক পরিচ্ছন্নতা ও মনোহর রূপ। অসংখ্য গোত্র, দল ও পরিবারে বিভক্ত এবং

গোত্রিয় ও পারিবারিক সংঘর্ষে সারাক্ষণ লিপ্ত এই আরববাসী নিজেদের গড়ে তুললো এক সুসংহত জাতি হিসেবে এবং পৃথিবীর মানুষকে শেখালো সত্যিকারের বিশ্বভ্রাতৃত্ব। যে আরবদের মাঝে সামান্যতম সহিষ্ণুতাও ছিলো না, যারা অতি সামান্য কারণেই উত্তেজিত হয়ে কলহে লিপ্ত হতো সেই আরবেরাই স্থাপন করলো সংযম ও সহিষ্ণুতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ড়। মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে নৃশংস ও অসভ্য আরববাসী এমন এক ঐশ্বর্যশালী ও বিস্ময়কর সভ্যতার জন্ম দিলো যা বিশ্বের ইতিহাসে তুলনাহীন। এটা এক অলৌকিক বিষয়—যাকে কলেমার অলৌকিকত্ব বলা যায়। একজন ব্যক্তির জীবনে তেইশ বছর কোনো গুর ত্বপূর্ণ সময় নয়, একটি জাতির জীবনে এই সময় আরো কম গুর ত্বপূর্ণ আর বিশ্ব ইতিহাসে এই সময়টুকু মহাসাগরের বুকে একটি বুদবুদের মতোই অনুলে- খযোগ্য। প্রত্যেক কৌতূহলী ব্যক্তির মনে যে প্রশ্নটি এখানে বড় হয়ে দেখা দেয় তা হচ্ছে এই যে, এতো অল্প সময়ের মধ্যে কী করে এই বিরাট পরিবর্তন দেখা দিলো এবং হজরত মুহম্মদ (সা.) এর শিক্ষার মধ্যে এমন কী উপাদান ছিলো যা মানুষের চিন্ড়া, অনুভূতি ও কর্মে এই বিস্ময়কর বিপ- ব সৃষ্টি করতে পারলো। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের মধ্যেই নিহিত রয়েছে কলেমার বৈপ- বিক রূপের পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধ্যাত্মিক বিপ- ব

উপাস্যের সন্ধানে

কলেমা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্ব ঘোষণা করেছে এবং একই সঙ্গে বহু দেবত্ববাদ, নাস্ড়িকতাবাদ ও দেবদেবী সম্পর্কে সকল ভ্রান্ড় ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিয়েছে। নাস্ড়িকতাবাদীরা উপহাস করে যে আল- াহ'র ধারণা মানুষের মনের ভয় থেকে উৎপন্ন এক অপচ্ছয়া; অজ্ঞাবাদীরা মনে করে আল- াহ এক জাগতিক শক্তি আর বহু দেববাদীরা সৃষ্টি করে অগণিত দেব দেবতার।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে আল- াহ তথা উপাস্যের সন্ধান করা। কখনো কখনো নৈরাশ্যের বশবর্তী হয়ে মানুষ উপাস্যের অস্ড়িত্ব অস্বীকার করে, কখনো বিভ্রান্ড় ও বুদ্ধিহারা হয়ে প্রতিটি বস্ড়ুকেই দেবতার মর্যাদা দেয় আর কখনোবা প্রকৃতির সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পায়। কেউ আল- াহকে সন্ধান করে মানবীয় ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে, কেউ সন্ধান করে পুষ্প ও বৃক্ষের মাঝে আর কেউ তাকে খুঁজে ফিরে নির্জনতায়। মানুষ উপাস্যের সন্ধান পাক আর না-ই পাক, তার অনুসন্ধান তাকে আস্ড়িক কর ক বা নাস্ড়িকই কর ক, উপাস্যের খুঁজে মানুষের সন্ধান অনন্ড়কাল যাবৎ চলতেই থাকবে। এর কোনো শেষ নেই। এটা শাশ্বত ও চিরন্ড়ন। আর এতেই রয়েছে মানুষের জ্ঞান, সৌন্দর্য ও সত্য অনুসন্ধানের জন্যে সূচনা ও সমাপ্তি।

হজরত ইব্রাহিম (আ.) কর্তৃক আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে অনুসন্ধান করার বিবরণ দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে মানুষের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির সংগ্রামকে অত্যন্ড় জীবন্ড়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'আমি এরূপভাবেই ইব্রাহিমকে নভোম ল ও ভূ-ম লের অত্যাশ্চর্য বস্ড়ুসমূহ দেখাতে লাগলাম—যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। অতঃপর যখন রজনীর অন্ধকার তার ওপর সমাচ্ছন্ন হলো, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেলো। বললো: এটি আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্ড়মিত হলো, তখন বললো: আমি অস্ড়গামীদের ভালোবাসি না। অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখলো, বললো: এটি আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেলো, তখন বললো: যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথপ্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ড় সম্প্রদায়ের অন্ড়র্ভুক্ত হয়ে যাবো। অতঃপর যখন সূর্যকে চক্চক্ করতে দেখলো, বললো: এটিই আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেলো, তখন বললো: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরিক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। আমি একমুখী হয়ে নিজ মুখকে ঐ**

সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোম ল ও ভূ-ম ল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেক নই' (৬ : ৭৫-৭৯)।

মানুষ ইচ্ছা কর ক আর না-ই কর ক তার বোধি ও বুদ্ধি উপাস্য তথা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দিকে আকৃষ্ট হয়। অকৃত্রিম সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি তার বোধি ও বুদ্ধির সহযোগিতায় সক্রিয় স্বয়ম্ভু ও চিরন্ড়ন উপাস্য আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে তাঁর সৃষ্টির মাঝেই প্রত্যক্ষ করে। কিন্ড়ু গণিতের সম্পাদ্যের মতো তাঁর অস্ড়িত্ব প্রমাণ করা যায় না, তাকে অনুভব করতে হয়। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের চেষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা নয়। মানুষের নিয়তির সঙ্গে এ প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে। কারণ মানুষ এবং তার প্রকৃতির রহস্য আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর প্রকৃতির রহস্যের মধ্যেই লুকানো আছে। অন্যকথায় বলা যায়, মানুষের নিজের সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান পেতে হলে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা অতীব জর রি। নিজের পরিবেশকে স্বীয় প্রকৃতির উপযুক্ত করে গড়ে তোলার ওপরই নির্ভর করে মানুষের সাবলীল ও সুষ্ঠু প্রগতি। নিজ প্রকৃতি সম্পর্কে আংশিক বা ভ্রান্ড় জ্ঞান নিয়ে মানুষ যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তা মানুষের জীবনযাপনের জন্য প্রতিকূলতার জন্ম দেয় এবং পরিশেষে মানুষকে অসুখী করে তোলে। আমাদের মনে রাখা উচিত আল- াহ একটি ধারণা মাত্র নয়, তিনি বাস্ড়ব সত্য। মানুষ তাঁর কাছ থেকেই আসে আবার তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। তাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ বাস্ড়ব এবং স্বাভাবিক। আরবিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে—'প্রত্যেক বস্ড়ুই তার উৎসের দিকে ফিরে যেতে চায়'। উপাস্যের তথা আল- াহ'র সন্ধানে মানুষের এই চিরন্ড়ন আকুতির ব্যাখ্যা এই প্রবাদ বাক্যের মধ্যেই নিহিত আছে। আন্ড়রিকতার সঙ্গে স্থির সংকল্প নিয়ে যে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে অনুসন্ধান করে সে অবশ্যই তাঁকে খুঁজে পায়। কলেমা অস্পষ্ট এবং অবান্ড়র কিছু প্রকাশ করে না বরং কলেমার শিক্ষা হচ্ছে স্পষ্ট এবং বাস্ড়ব সম্মত। তাই মানুষের ভয়ভীতি ও অজ্ঞতা প্রসূত সৃষ্ট দেবদেবীকে কলেমা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রকৃত স্বরূপ মানুষের নিকট প্রকাশ করে।

দেবদেবীর অস্বীকৃতি

যেসব দেবদেবীকে কলেমা অস্বীকার করে তারা কারা? মূলত তারা হচ্ছে প্রাকৃতিক শক্তি। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সকল গুণবাচক নামের মধ্যে যেটি প্রকৃতিতে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান সে গুণটি হলো তাঁর সর্বশক্তিমত্তা রূপ। তাই মানুষ বিচার বিবেচনা না করেই শক্তির পূজা শুর করলো এবং যাকেই তার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী বলে মনে হলো তাকেই সে ঈশ্বরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলো। যেসব প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের মনে ভয়ভীতি সঞ্চার করলো, সর্বপ্রথম তাদের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি পড়লো। সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, বজ্র, ঝঞ্ঝা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতি যা কিছু মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার

করতে সক্ষম হলো তা-ই মানুষের ঈশ্বর বা প্রভু হয়ে দাঁড়ালো। একবার বহু দেবতার ধারণা যখন মানুষের মনে জন্ম নিলো তখন দেব-দেবতার তালিকাকে স্ফীত করার ব্যাপারে দ্বিধা বা সংকোচ দূরীভূত হলো। এভাবে পশু, সরীসৃপ, স্তম্ভ, পাথর বা গাছপালা যাকেই মানুষ প্রকা বা শক্তিশালী বলে মনে করলো সেসবই দেবতার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে দেবতার তালিকাকে দীর্ঘায়িত করতে লাগলো এবং মানুষের মাঝে বীরদের পূজা করার মানসিকতা সৃষ্টি হলো। এরই প্রেক্ষিতে সমাজের প্রতিভাবান বা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যথা–সম্রাট, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী প্রমুখ দেবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন।

মানুষ তার অজ্ঞতা ও ভীতির কারণে দেবতার সৃষ্টি করছে সত্য কিন্তু এর দ্বারা একথা মোটেও প্রমাণিত হয় না যে, আল- াহ বা উপাস্য বলে কেউ নেই। প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন মরীচিকায় সত্যিকারের পানি থাকে না সত্য, কিন্তু এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, পানি অস্তিত্বহীন ও অবাস্তব। মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে মানুষ বুঝতে সক্ষম হলো যে, এসব দেবতাকে ঈশ্বরত্ব দেয়া অযৌক্তিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ যাকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ভাবতো এবং যা কিছু মানুষের ক্ষতি করতে পারে বলে মনে করতো, সেসবকে পূজা করার প্রবণতা মানুষের মনের মধ্যে এমনভাবে শিকড় বিস্তার করেছিলো যা মানুষের ইচ্ছে, আবেগ ও অনুভূতিকে অতিমাত্রায় বিকৃত করেছিলো। এর ফলশ্র তিতে মানুষের অজ্ঞতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দিয়ে আচ্ছন্ন তার বুদ্ধি, এসব দেবতাদের সমর্থনে জাঁকালো সব দর্শন সৃষ্টি করে যুক্তির ইন্দ্রজাল বিস্তার করে কুংস্কারকে একটা শোভন রূপ দান করতে চেষ্টা করলো। এর মর্মান্তিক ও শোচনীয় ফল দাঁড়ালো এই যে, মানুষ নিজের মধ্যে সৃষ্টি করলো তার স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রগতির পরিপন্থি এক হীনমন্যতাবোধ। সে মনে করলো যে, তার চারপাশের সবকিছুই তার থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সে হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে হীনতম সৃষ্টি। তাই স্বভাবতই সৃষ্টি জগতের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে দাঁড়ালো দাসত্বসুলভ। সে সব সময় চেষ্টা করতে লাগলো প্রার্থনা, পূজা, বলিদান প্রভৃতির মাধ্যমে এসব দেব-দেবতার ক্রোধাগ্নির উপশম ঘটাতে। এসব দেবদেবীই হলো মানুষের প্রভু আর মানুষ হলো তাদের ক্রীতদাস। মানুষ ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে এই হাস্যকর ধারণা মানুষের মর্যাদাকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করেছে, সৃষ্টি জগতে মানুষের ভূমিকাকে করেছে অপব্যাখ্যা এবং তার ভাগ্যকে করেছে ক্ষতিগ্রস্ত। এজন্যই কলেমা এক কথায় এসব দেবদেবী, ভ্রান্ত ধারণা এবং কুসংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইচ্ছার প্রভাবমুক্ত বিশুদ্ধ যুক্তি ও বুদ্ধি, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে কখনো ধর্ম বলে গ্রহণ করতে পারে না। মানবচিন্তার মাধ্যমে অন্যায় সংযোজন (প্রক্ষেপণ) এবং আত্মমুখী ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাশ্চাত্যে যেভাবে ধর্মের বিকাশ ঘটেছিলো সেটা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পাশ্চাত্যের অসাধারণ মেধাসম্পন্ন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ ধর্মকে বর্জন করে বা ধর্মের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কাজ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আর্যদের ধর্ম হচ্ছে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ। ভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দর্শন বেদান্ত ঈশ্বরের একত্বের প্রচার করা হয়েছে। বেদান্ত সূত্রসমূহের বিখ্যাত ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য বিশুদ্ধ

একেশ্বরবাদেরই প্রচারক ছিলেন। তবে তিনি সে সময়ে প্রচলিত বুদ্ধযুগ পরবর্তী মূর্তিপূজার প্রতি সহিষ্ণু নীতি অবলম্বন করেছিলেন এবং একে তিনি 'প্রতিকতা' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু এ থেকে এমন ভাবা ঠিক নয় যে, বর্তমানে ভারতে বহু ঈশ্বরবাদ প্রচলিত নেই। বেদান্ত দর্শনের একেশ্বরবাদ থেকে ধীরে ধীরে সর্বেশ্বরবাদ (ঈশ্বর ও সৃষ্টি অভেদ: এই মতবাদ) ও অদ্বৈতবাদ বিকাশ লাভ করে। সর্বেশ্বরবাদ থেকে শুর হয় প্রতিকতা এবং প্রতিকতার মাধ্যমেই সৃষ্টি হলো বর্তমানে প্রচলিত পূর্ণাঙ্গ বহু ঈশ্বরবাদ। অপরদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রগতির লালনাগার ইউরোপ চলে গেলো একেবারে এর বিপরীত মের তে। ইউরোপবাসী সরাসরি আল- াহ এবং ধর্মকে অস্বীকার করলো। খ্রিস্টধর্মের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ থেকে পাদরিরা উদ্ভাবন করলেন ত্রিত্ববাদ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করলেন কতগুলো নিরর্থক আচার-অনুষ্ঠান। আর তারা রাষ্ট্রের সহায়তায় জোরজুলুম, নির্যাতন ও সমাজচ্যুতি ইত্যাদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণকে তাদের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য করলেন। তাই বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তির কাছে যখন চার্চ তথা যাজকীয় ধর্ম পরাভূত হলো, তখন ইউরোপের মনীষীরা যাজকীয় ধর্মের মধ্যে কোনো আকর্ষণ দেখতে না পেয়ে শূন্যতাবাদমূলক জড়বাদের ভিত্তিতে এক জীবনব্যবস্থা গড়ে তুললেন। বিশ্বের মুসলমানগণও একইভাবে বর্তমান যুগে ইসলামের মূলমন্ত্রের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করে কবর পূজা বা স্মৃতিসৌধ পূজার প্রতি আসক্ত হচ্ছেন। তাই দেখা যায় পৃথিবীর সব ধর্মের মাঝেই এখন কোনো না কোনো আকারে বহু দেবদেবী অর্চনার প্রবণতা বিদ্যমান। আর এটাই হচ্ছে ধর্মের প্রতি সর্বজনীনভাবে উদাসীনতার কারণ।

আল- াহ ও ধর্মে অস্বীকৃতি

আল- াহ ও ধর্মে অস্বীকৃতি হচ্ছে বহু ঈশ্বরবাদের বিপরীত মনোভাব। মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু ঈশ্বরবাদ মানুষের ওপর তার প্রভাব ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলেছে। অপরদিকে যন্ত্র ও যান্ত্রিক জীবনের ক্রমোন্নতি ও বিস্তৃতি মানুষকে ঠিক তার বিপরীত প্রান্তে ঠেলে দিয়েছে। মানুষ তখন মনে করলো যে, একেশ্বরবাদের এক ঈশ্বর, বহু ঈশ্বরবাদের অসংখ্য ঈশ্বরের মতোই ক্ষতিকর ও অবাস্তব এবং মানুষই বহু ঈশ্বরবাদের অসংখ্য দেবদেবীকে একত্রিত করে এক ঈশ্বরের সৃষ্টি করেছে। এভাবে সে হতবুদ্ধি হয়ে বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। পবিত্র কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্ব ঘোষণা করে এ দু'য়ের সমন্বয় সাধন করে এবং মাত্র কয়েকটি শব্দে এসব

মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্যের অবসান ঘটায়। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে—**'অবিশ্বাসীরা বলে যে, সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার' (৩৮ : ৫)।**

শূন্যতাবাদ বস্তুকে একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করে এবং মনে করে যে, সৃষ্টি হচ্ছে একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া। একজন শূন্যতাবাদীর কাছে আল- াহ হচ্ছেন একটি ধারণা মাত্র, যা মানুষের পারিপার্শ্বিক পরিবেশলব্ধ জ্ঞান এবং নিজের বিবেকের প্রতিফলন। তার কাছে ধর্ম হচ্ছে শোষণের অলৌকিক অনুমোদন এবং শোষণের হাতিয়ার। মানুষের অহমিকা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি উপরোক্ত মতের পক্ষে দর্শনের সৌধ নির্মাণ করতে বিলম্ব করে নি।

মানুষের অহম সত্তা সব সময়ই তার নিজের ইচ্ছার সীমাহীন স্বাধীনতা চায়। তাই সে তার ইচ্ছাকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়নের যেকোনো ধরনের চেষ্টারই বিরোধীতা করে মুক্তি ও স্বাধীনতার নামে উশৃঙ্খলতা এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রশ্রয় দেয়। সুতরাং নিহিলবাদ বা শূন্যতাবাদ অহম সত্তার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় জীবনদর্শন। বস্তুগত আরাম আয়েশের পথকে বৈধভাবে ভোগ করার জন্যে অহম সত্তা সকল প্রকার প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার বিরুদ্ধেই একটা নিজস্ব মনোভাব গড়ে তোলে। শূন্যতাবাদমূলক জড়বাদ বস্তু এবং বস্তুগত আকার আকৃতিকে স্বীকার করে এবং মানুষের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিকে সে অসীম ক্ষমতাবান বলে মনে করে। এ মতবাদ অনুযায়ী মৃত্যু মানুষকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে; সে আরো মনে করে আত্মার অমরত্ব বা অস্তিত্ব এক অলিক কাহিনী, আর এটি উদ্ভাবন করেছেন সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রের অনুসারীরা, ধর্মের দোহাই দিয়ে জনগণকে শোষণ করার উদ্দেশ্য। এ মনোভাব একদিকে যেমন মানুষের মর্যাদার ভয়ংকর হানী ঘটায় অন্যদিকে তেমনই তার মধ্যে এক মিথ্যা অহমিকার সৃষ্টি করে। যার ফলশ্রুতিতে মানুষের জীবনের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। শূন্যতাবাদ মানুষের মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশের ওপর অস্বাভাবিক ও অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে কিন্তু অজ্ঞতাবশত মানুষের সামগ্রিক ক্ষমতার সুসামঞ্জস্য বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। জীববিদ্যার জ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি যে, জীবের সামঞ্জস্যহীন ক্রমবৃদ্ধির ফলে ম্যামথ হাতি ও দানব আকৃতির বানরের মতো অনেক জীবজন্তু পৃথিবীর বুক থেকে ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়েছে। সুতরাং এ কথা পরিষ্কার যে, শূন্যতাবাদমূলক জড়বাদ যদি মানবজীবনের দর্শন হিসাবে সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে তাহলে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে মানুষের অস্তিত্বও নিঃশেষে বিলুপ্ত হবে। মানুষের জীবনের গতিপথে বিশ্বাসের যদি কোনো নিয়ন্ত্রণ শক্তি না থাকে তবে কোনো কিছুতেই বিশ্বাসের গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন হয় না। বিশ্বাস বলতে একটি বিশেষ মানসিকতাকে বোঝায়। এই মানসিকতা তার অন্তর জগতে লালিত সৌধের অনুরূপ বহিঃজগতেও এক সৌধ গড়ে তোলে। মানসিকতার এ সৌধ যদি মানুষের প্রকৃতির অনুকূল হয় তবেই তার প্রভাব হয় ফলপ্রসূ। আর মানসিকতার সৌধ যদি মানুষের প্রকৃতির প্রতিকূল হয় তাহলে তার প্রভাবে মানুষের জীবনে ঘটে অবনতি। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মতৎপরতায় বিশ্বাসের সত্যিকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এটাই।

নিষিদ্ধ ফল

বাইবেলে বর্ণিত নিষিদ্ধ ফল কিংবা আল কুরআনে বর্ণিত নিষিদ্ধ বৃক্ষ কিংবা এ ধরনের ফলবতি কোন গাছ দ্বারাই মানুষ সর্বপ্রথম যন্ত্র তৈরি করেছিলো। কিন্তু যন্ত্র তৈরির পূর্ব পর্যন্ত মানুষও অন্যান্য জীবজন্তুর মতো প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করতো। তার দেহ, মন ও মস্তিষ্ক প্রকৃতির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্য বজায় রেখে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলতো। তারা ছিলো অসীমের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা। পশুপাখি আজও যেমন কোনো যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছাড়াই তার নিজের খাবার সংগ্রহ করতে পারে, মানুষও তেমনই তখন কোনো যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়েই নিজের জীবিকা অর্জনসহ প্রকৃতির রহস্য জানতে পারতো। কোনো কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই সে নিজেকে শীত, গ্রীষ্ম ও আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করতে পারতো। তার নিজের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলো এবং তার জীবন ও প্রগতি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সে তখন ছিলো স্বর্গের বাগানে আর তার জীবনের সেই অবস্থাই ছিলো তার স্বর্গ। যে মুহূর্তে মানুষ মাটি খোঁড়ার জন্যে বা শিকার ধরার জন্যে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলো সেই মুহূর্তেই ঘটলো তার স্বর্গচ্যুতি এবং প্রবেশ করলো এক কৃত্রিম জীবনে। এতে করে সে এখন যন্ত্রের একটি সচেতন অংশে পরিণত হলো। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, আজ যদি সমস্ত যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলা হয় বা ধ্বংস করে ফেলা হয় তবে সে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারবে না। উৎপাদনের এই সব কৃত্রিম যন্ত্রপাতির আবিষ্কার শুধু যে মানুষের মন ও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক উন্নতি ও বিকাশকে রুদ্ধ করে তাদের ক্ষয়িষ্ণু করে তুললো তাই নয়, উপরন্তু চরম দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, এর ফলে উদ্বৃত্ত-শ্রম-মূল্য সৃষ্টি করে তার সুখ শান্তিকে চিরতরে বিনষ্ট করা হলো। সেই থেকে মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের চিন্তার একমাত্র বিষয় হলো অপরের এই উদ্বৃত্ত-শ্রম-মূল্যকে কীভাবে নিজের আরাম আয়েশ ও আমোদ-প্রমোদের জন্যে ব্যবহার করা যায়। অন্যকে শোষণ করার জন্যে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার ওপর কীভাবে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যায় সেই চিন্তা ও তার ক্রমবর্ধমান লালসা মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বিষাক্ত করে তুললো। শূন্যতাপন্থি জড়বাদ হচ্ছে মানুষের অধঃপতনের ধারার শেষ স্তর। এরপরই মানুষ 'দ্বীন', 'ধর্ম' বা 'রিলিজিয়নের' দিকে হয়তো পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবে।

মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখা যায়, সে কী ছিলো আর কী হয়েছে এবং বর্তমান জীবন ব্যবস্থায় যদি নিজের খেয়ালখুশি মতো তাকে চলতে দেয়া যায় তাহলে ভবিষ্যতে তার পরিণতি কী দাঁড়াবে। অতীতে সে ছিলো দীর্ঘায়ু, তার ইন্দ্রিয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও সহজাত প্রবৃত্তি ছিলো সুস্থ, সবল ও সক্রিয়। মাইলের পর মাইল সে অনায়াসে পায়ে হেঁটে যেতে পারতো। খালি চোখেই দেখতে পেতো প্রকৃতির বর্ণ-বৈচিত্র্য, শুনতে পেতো তার চারিপাশের মধুর সুর-লহরি, উপভোগ করতে পারতো বন্য ফুলের সুকোমল সুগন্ধ। আর তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলো সহজেই তাকে বলে দিতে পারতো ভূকম্পন, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টির আগমন বার্তা। বিচিত্র বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদ নিয়ে এ পৃথিবী ছিলো তার কাছে নন্দনকানন স্বরূপ। কিন্তু বর্তমানে মানুষ এক ভাগ্যাহত জীব। সে যতোই সভ্য হচ্ছে,

যান্ত্রিক জীবনের দাসত্বও তার ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ সে কৃত্রিম দাঁত ছাড়া খেতে পারে না, চশমা না হলে দেখতে পারে না, মাইক্রোফোন না হলে কথা বলতে পারে না এবং শব্দগ্রাহক যন্ত্র ছাড়া শুনতে পারে না। নিজেকে সে একেবারেই ধ্বংস করে ফেলেছে। সে এক দিকে স্রষ্টার বির"দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে অপরদিকে নিজেকে পরিণত করেছে যন্ত্র নামক দেবতার ঘৃণ্য ক্রীতদাসে। এখানেই যদি মানুষ থেমে না দাঁড়ায় তাহলে কিছুদিন পর সে যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া শ্বাস-প্রশ্বাসও গ্রহণ করতে পারবে না। আর তখনই সে তার নিজের অনিবার্য ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। যে মানুষ খালি হাতে বন্য জন্"ুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারতো অদূর ভবিষ্যতে সে এতোই দুর্বল হয়ে পড়বে যে, আজ যেসব কীটপতঙ্গকে সে দু'পায়ে মাড়িয়ে যেতে পারে তারাও তাকে খেয়ে ফেলতে কসুর করবে না।

এই কৃত্রিম জীবনব্যবস্থায় মানুষ আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাহায্য ছাড়া তার নিজের সত্তার পরিচয় পেতে পারে না। একবার যখন সে নিজেকে যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে যান্ত্রিক জীবন তথা কৃত্রিম জীবনব্যবস্থা বেছে নিয়েছে, তখন সে ইচ্ছা করলেই প্রকৃতির মাঝে ফিরে গিয়ে তার হারানো স্বর্গকে পুনরায় লাভ করতে পারবে না। সুতরাং প্রাকৃতিক জীবনব্যবস্থা এবং যান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা, এ দুই চরম অবস্থার সমন্বয়ের মাঝেই তার পরিত্রাণ নিহিত। সব ধর্ম ও দর্শনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মন্দের ভেতর থেকে ভালোর সৃষ্টি অর্থাৎ মানুষকে তার নিজের সত্তা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান দান করা যাতে করে সেই জ্ঞানকে তাঁর নিজের গড়া জীবনব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল করে নিজেকে এমনভাবে চালিত করতে পারে যার ফলে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে কোন বাধা বা বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট যান্ত্রিক ব্যবস্থার আধিপত্য বা সার্বভৌমত্বকে প্রাধান্য দিয়ে সুশৃঙ্খল ভারসাম্যময় জীবনব্যবস্থা অর্জন করা সম্ভব নয়। এজন্যে প্রয়োজন নির্ভুল জ্ঞান অর্জন এবং অর্জিত জ্ঞান দ্বারা নিজেকে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে অত্যন্"ড় সতর্ক ও সাবধানতার সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে নিজের সংযোগ স্থাপন।

মানুষের স্বরূপ ব্যাখ্যায় কলেমা

কলেমা মানুষকে তার সত্য প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় অর্থাৎ কলেমা মানুষের স্বরূপকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে। কলেমায় যে এক ও অদ্বিতীয় আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কথা বলা হয়েছে, সেই অদ্বিতীয় আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে মানুষের সম্ভাবনা অপরিসীম। কিন"ু সে যদি নিজের সত্তার বির"দ্ধাচরণ করে অসংখ্য উপাস্যের সৃষ্টি করে বা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অস্তিত্ব অস্বীকার করে তবে উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ পরিণত হবে নিকৃষ্টতম জীবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'কসম ডুমুর ও যয়তুনের' কসম সিনাই প্রান"ড়রস্থ তূর পাহাড়ের আর কসম এই শান্তিময় নগরীর, নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরতম অবয়বে। অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নিচ থেকে নিচে, কিন"ু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার' (৯৫ : ১-৬)**। পাপের মধ্যে মানুষের জন্ম নয় বরং তাদের জন্ম স্বর্গীয় সুখের সন"ান হিসেবে। মানুষ জন্মায় স্বাধীন, তাদের বন্ধন তাদের নিজদেরই সৃষ্টি। তাদের জীবনে যদি ভারসাম্য রক্ষিত হয় তবে মানুষ যেকোনো উচ্চতর শিখরে পৌঁছাতে পারে। এমনকি আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নৈকট্যও লাভ করতে পারে। পক্ষান"ড়রে তারা যদি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং নিজেদের সম্বন্ধে হীন বা অতিরঞ্জিত ধারণা পোষণ করে তবে তারা নিজের কৃতকর্মের দ্বারা নিজেদের অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করে সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। মানব প্রকৃতি ও তার সম্ভাবনার মহত্বের বাস"ব প্রমাণস্বরূপ ডুমুর, যয়তুন, সিনাই পাহাড় ও শান্তি"র নগরী মক্কা এ চারটি প্রতীকের সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ মানবতার নিদর্শনস্বরূপ বুদ্ধ, ঈশা, মুসা এবং মুহম্মদ (সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম) এই চারজন মনীষীর জ্বলন"ড় উদাহরণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আলঙ্কারিক ভাষায় শান্তি"র পথ তথা বেহেশতের পথকে চুলের থেকে সর", তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট ক্ষুরের চেয়ে ধারালো এবং লাখ লাখ মাইলের চেয়েও দীর্ঘ বলে বর্ণিত হয়েছে। ভারসাম্য রক্ষা করে যারা সতর্কতার সঙ্গে চলে তারা গন"ব্যস্থলে (বেহেশতে) পৌঁছতে পারে আর যারা অসতর্ক এবং ভারসাম্যহীন তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নিজেদের ভাগ্যকে বিনষ্ট করে ফেলে। আর এজন্যে তারা নিজেরাই এককভাবে দায়ি।

মুসলিম ভাষ্যকারেরা গৌতম বুদ্ধকে পয়গম্বর বলে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, অসেমিটিক পয়গম্বরদের কথা পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে উলে- খিত হয় নি। কিন"ু তাঁরা ভুলে যান যে, কুসংস্কার কিংবা অহমিকার স্থান ইসলামে নেই। ঐতিহাসিক দিক থেকে ডুমুর নিশ্চয়ই বুদ্ধের প্রতীক। হজরত মুহম্মদ (সা.) যেমন মক্কা নগরীর হেরা পর্বতে প্রথম ওহি ও রিসালতের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন, তেমনই বুদ্ধ একটি বোধিবৃক্ষের (ডুমুর গাছের) তলায় নির্বাণ লাভ করেছিলেন। মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদগণ বুদ্ধকে পয়গম্বর বা রাসুল শ্রেণিভুক্ত করতে ইতস"ত করার অন্য একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, বুদ্ধের বাণী আমরা বর্তমানে যেভাবে পেয়েছি, তাতে তিনি আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অস্তিত্বকে পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেন নি। কিন"ু একথা ভুললে চলবে না যে, বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে তাঁর বাণী সংকলিত হয়েছে। এজন্যে এটা সহজে অনুমান করা যেতে পারে যে, এই কয়েক শতাব্দীতে তাঁর বাণীর আত্মমুখী ব্যাখ্যা ও প্রক্ষেপণ দ্বারা এগুলো ভীষণভাবে বিকৃত হয়েছে। অন্যান্য পয়গম্বরের মতো গৌতম বুদ্ধ তাঁর আবির্ভাবের সময়ে প্রচলিত ধর্মব্যবস্থাকে অস্বীকার করেছিলেন। পয়গম্বরদের আবির্ভাব ঘটে তখনই যখন ধর্মের পবিত্রতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় আর আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও ধর্মের নামে নানারূপ জঘন্য বিশ্বাসের প্রথা প্রচলিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—**'হে ভরত (অর্জুন)! যখন ধর্মের পবিত্রতা বিনষ্ট হয় আর অধর্ম প্রাধান্য লাভ করে তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। পুণ্যবানদের রক্ষা করা, পাপীদের ধ্বংস করা এবং ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।'** হজরত ঈসার (আ.) সমসাময়িক ইহুদিরা যেমন হজরত ঈসা (আ.)কে এবং হজরত

মুহম্মদ (সা.) এর সমসাময়িক ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা যেমন হজরত মুহম্মদ (সা.)কে আক্রমণ করেছিলো, তেমনই ভারতের বিকৃত প্রাচীন ধর্মের প্রতিনিধিরা বুদ্ধকে আক্রমণ করেছিলো এবং তাঁকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়েছিলো। তারা বুদ্ধকে নাস্তিক বলে প্রচার করলো এবং তার ধর্মের নাম দিলো 'শূন্যবাদ'। এ শূন্যবাদের অর্থই হলো আদি কারণ রূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। আধুনিক খ্রিস্টধর্মকে যেমন হজরত ঈসার (আ.) ধর্ম বলে স্বীকার করা যায় না, তেমনই বুদ্ধের দর্শন বা মতবাদ আমরা যে আকারে পেয়েছি তাকেও বুদ্ধের বিশুদ্ধ ধর্ম বলে স্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে এই যে, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মুসা, বুদ্ধ, ঈসা ও মুহম্মদ (সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম) এ চারজন ধারাবাহিকভাবে মানবজাতির মহান শিক্ষাগুরু। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান দুনিয়া এ চারজন মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক প্রভাবেই বিভক্ত। এঁরা সকলে একই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত।

আল- াহ'র গুণাবলী

সত্যের একনিষ্ঠ অনুরাগীদের মনে মুসা, বুদ্ধ, ঈসা ও মুহম্মদ (সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়াসাল- াম) আজও আশা ও আস্থা জাগিয়ে তোলেন। তাঁদের আদেশ, উপদেশ ও আদর্শ মানুষকে স্রষ্টার দিকেই স্পষ্ট পথের ইঙ্গিত দেয়। পৃথিবীতে মানুষ আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবেই সৃষ্টি হয়েছে। তাই আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার গুণাবলী অনুশীলন করে এবং নিজের মধ্যে এসবের বিকাশ ঘটিয়ে নিজেকে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর স্তরে উন্নীত করার সম্ভাবনা মানুষের মধ্যে নিশ্চয়ই রয়েছে। মানবসৃষ্টির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ফেরেশতাদের বলেন—**'নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি পাঠাচ্ছি' (২: ৩০)**। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। নিজের গুণাবলীর মাধ্যমে নিজেকে দৃশ্যমান করে তোলেন। এই গুণাবলীকে ইসলামি পরিভাষায় বলা হয় 'আসমা উল হুসনা বা সুন্দর নামসমূহ'। পবিত্র কুরআনে উলি- খিত আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিরানব্বইটি গুণের মধ্যে 'কামেল' বা 'পূর্ণতাপ্রাপ্ত' এই গুণটি বিশেষভাবে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। কারণ আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অবশিষ্ট আটানব্বইটি গুণ আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতিনিধি ও সৃষ্টির সেরাজীব মানুষের মধ্যে অতি ক্ষুদ্রাকারে বিদ্যমান। এসব গুণের ক্রমবিকাশ সাধনের সহজাত ক্ষমতা মানুষের আছে। এসব ঐশ্বরিক গুণাবলী মানুষ, বিশ্ব-প্রকৃতি ও আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকভাবে ব্যাখ্যাদান করে। এসব গুণের ক্রমবিকাশ সাধনের অর্থ ঘরের নির্জন কোণে বসে তসবিহযোগে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার গুণবাচক নামগুলি আবৃত্তি করা নয় বরং এর অর্থ হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে এসব পবিত্র ঐশ্বরিক গুণের সক্রিয় প্রয়োগ। উদাহরণস্বরূপ আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার গুণগত নাম 'রব' এর কথাই ধরা যাক। এই 'রব' শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকর্তা। শূন্য থেকে মানুষ কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, সে সমগ্র সৃষ্টিকে পালন করতে পারে না বা পূর্ণতার দিকে এর বিবর্তনও ঘটাতে পারে না। কিন্তু আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে সে সৃষ্টি-প্রতিভার অধিকারী এবং সে উপকরণের সাহায্যে নতুন নতুন বস্তুসামগ্রী তৈরি করতে পারে। এভাবে প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্য থেকেই মানুষ নতুন জীবনদর্শন সৃষ্টি করে বর্তমান মানবজাতিকে এক নতুন মানবজাতিতে পরিণত করতে পারে। সমগ্র বিশ্বকে প্রতিপালন করার ক্ষমতা তার নেই, কিন্তু তার প্রতিবেশীদের ভরণপোষণে সাহায্য করার ক্ষমতা তার নিশ্চয়ই আছে। সে সারা বিশ্বের বিবর্তনকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না, কিন্তু সে উপদেশ দিয়ে এবং নিজে আদর্শ স্থাপন করে তার কাছাকাছি পরিবেশের মানুষকে সত্য পথ দেখাতে পারে। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই মৌলিক (রব) গুণের অনুশীলন করে মানুষ তার হিতসাধন করার ক্ষেত্রকে এবং সৃষ্টিকে প্রতিপালন ও বিবর্তন করার ক্ষমতাকে ক্রমশ বিকশিত করে তার সৃষ্টি প্রতিভাকে ঐশীশক্তির অধিকারী করে তুলতে পারে। আর ঠিক এভাবেই আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অপরাপর গুণাবলীরও অনুশীলন করা যেতে পারে। বস্তুত আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধনের অর্থ এসব ঐশীগুণের অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন এবং জীবনে ও জীবনব্যবস্থায় এদের প্রয়োগ বা বাস্তব রূপায়ন। মানুষের মহত্বের সাক্ষী হিসেবে পবিত্র কুরআনে উলি- খিত পূর্ণ মানবতার মহান আদর্শ চার মহাপুরুষের প্রত্যেকেই নিজের কর্ম ও শিক্ষার মাধ্যমে নতুন মানবতা সৃষ্টি করে মানুষকে এমন এক জীবন বিধান শিক্ষা দিয়েছেন যা মানুষের ও অন্যান্য জীবের স্বাভাবিক ভরণপোষণ ও ক্রমবিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

আধ্যাত্মিক বিপ- ব

আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-ই মহাবিশ্বের স্রষ্টা এবং মানুষই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে যে, সে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দাসত্ব করবে এবং যে নিয়মকানুন দ্বারা বিশ্বব্রহ্মা পরিচালিত হচ্ছে তার প্রতি অনুগত থাকবে। সৃষ্টির বাকি সকলের কর্তব্য হচ্ছে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকা এবং তার (মানুষের) সুখশান্তি বৃদ্ধি করা। কলেমা এমন এক মানসিকতা সৃষ্টি করতে চায় যার সঙ্গে মানুষের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার নির্ভুল পরিচয় আছে এবং যা মানুষকে বহু ঈশ্বরবাদের হীনমন্যতা বা নাস্তিকতার অহমিকা এ দুই থেকে রক্ষা করে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। পবিত্র কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে—**'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি' (১:৪)**। একমাত্র আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া কারো থেকেই মানুষ ছোট নয়। তার জ্ঞানের ভেতরে বা জ্ঞানের বাইরে যা কিছু আছে তার মধ্যে সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলা ও মানুষের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। সেখানে মধ্যবর্তী কেউ নেই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই আদেশে তোমাদের কাজে নিয়োজিত রয়েছে' (১৬ : ১২)** এবং **'তোমরা কি দেখনা নভোম-ল ও ভূ-ম-লে যা কিছু আছে সবই আল- াহ তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন' (৩১ : ২০)**। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তার সমস্ড় ক্ষমতার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সাধন করে নিজের কল্যাণার্থে তার পারিপার্শ্বিক জড় পরিবেশকে ব্যবহার করা। আত্ম-প্রকৃতির এ জ্ঞানই মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার চিন্ড়া, অনুভূতি ও কর্মের ক্ষেত্রে এক বৈপ- বিক পরিবর্তন আনয়ন করেছে। বহু ঈশ্বরবাদ অনুযায়ী সে ছিলো সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম এবং সে হিসেবে নিজেকে সে মনে করতো সৃষ্টির হীনতম জিনেসেরও অধীন। অপরদিকে নাস্ড়িকতাবাদ তাকে ঠিক এর বিপরীত প্রান্ড়ে পৌঁছে দেয় এবং একইভাবে তার ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। কিন্ড়ু কলেমা মানুষকে সবরকমের কৃত্রিম বন্ধন থেকে নিস্কৃতি দিয়ে তাকে মুক্ত ও মহিমান্বিত করে তোলে। কলেমার এই ইন্দ্রজালিক প্রভাবে যাবতীয় মহৎ গুণাবলী বর্জিত আরব বেদুইনরা অল্প দিনেই রূপান্ড়রিত হয়েছিলো এক অতিমানবীয় জনগোষ্ঠীতে। প্রথম যুগের মুসলমানদের মহত্ব ও গৌরবের মূলে ছিলো মানুষের নিজের স্বাভাবিক মর্যাদার এই বৈপ- বিক ধারণা ও আদর্শের অনুপ্রেরণা। কলেমার তৌহিদবাদ অর্থাৎ আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্ব মানুষকে উর্ধ্বলোকে আরোহন করে অনন্ড়ে বা অমরত্বে পৌঁছার পাখা দান করে। আর এর মধ্যেই রয়েছে কলেমার আধ্যাত্মিক বিপ- বের সত্যিকারের পরিচয়।

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক বিপ- ব

নীতিতত্ত্ব

ভালো-মন্দের যে চেতনা মানুষের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা-ই হচ্ছে নৈতিকতা। ডারউইনের যোগ্যতমের উদবর্তনবাদ (Survival of fittest) প্রকাশিত হবার পর থেকে পশ্চিমা দেশগুলোতে নীতিতত্ত্ব ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেয়। বিখ্যাত দার্শনিক নিটশ এর মতে—'বলবানদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে দুর্বলেরা নীতিতত্ত্ব সৃষ্টি করেছে'। আসলে এটা সম্পূর্ণ ভুল এবং এর বিপরীতটাই বরং সত্যি। দুর্বলেরা কখনো আইনকানুন ও নৈতিকতা তৈরি করে সেগুলোকে বলবানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে না। বরং অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ শান্ড়িতে ভোগ করার জন্যে এবং শোষণের পথকে অধিকতর প্রশস্ড় করার জন্যে বলবানরাই আইনকানুন ও নৈতিকতার মাপকাঠি তৈরি করে; মানুষের তৈরি নৈতিকতার মাপকাঠির ক্ষেত্রে একথাটিই সত্যি। ডারউইনের যোগ্যতমের উদবর্তনবাদে (Survival of fittest) বর্ণিত তত্ত্বও সঠিক নয়। কেননা যোগ্যতমরা কখনো জীবনযুদ্ধে টিকে থাকে না। তারা সাধারণের মাঝে দক্ষতা সৃষ্টি করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। এরপর যেসব প্রাণী সন্ড়ান উৎপাদনের পরপরই মারা যায়, যোগ্যতমরাও তাদেরই মতো ধ্বংস হয়ে যায়।

নৈতিকতার মাপকাঠি চরম ও সর্বজনীন নয়। সুসভ্য ইউরোপের উন্মুক্ত পার্কে যৌন ব্যভিচারকে হালকাভাবে দেখা হয় এবং তার প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করা হয় অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাকে নীতিবির-দ্ধ কাজ বলে মনে করা হয়। অপরদিকে প্রাচ্যে বহুপত্নী রাখার পক্ষে জোরালো নৈতিক সমর্থন থাকলেও অবৈধ যৌন সম্পর্ক এখানে নিন্দনীয়। এই বৈসাদৃশ্য স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম। বিশেষভাবে এই পার্থক্য তখনই দেখা যায় যখন মানুষের জড় পরিবেশ তার বিবেক ও যুক্তির ওপর আধিপত্য বিস্ড়ার করে কিংবা যখন মানুষের অহমিকা বা স্বার্থপরতা তার পরার্থপর প্রবণতাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে আর বুদ্ধি হয় ইচ্ছা দ্বারা আচ্ছন্ন। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট এসব নৈতিক চেতনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষের দুঃখদুর্দশাকে বাড়িয়ে তোলে কেননা এসব কৃত্রিম নৈতিক ধারণা মানুষের স্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন সম্পর্কে ত্র-টিপূর্ণ জ্ঞান থেকেই সৃষ্ট। সারা মানবজাতির জন্যে একইরূপ বিধিবিধান প্রচলন তখনই সম্ভব হতে পারে যখন মানুষ তার প্রকৃতির বাস্ড়ব স্বরূপ উপলব্ধি করার মতো প্রজ্ঞার অধিকারী হবে ও একে স্বীকার করার মতো সাহস অর্জন করবে এবং অপরের অনুরূপ অধিকার খর্ব না করে নিজের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর চাহিদা পূরণের ভিত্তিতে গড়ে তুলবে তার নৈতিকতা।

ইসলাম মানুষকে স্বেচ্ছাচারী হতে শেখায় না আবার স্বাধীনতার নামে উশৃঙ্খল জীবনযাপন করতেও তাকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং ইসলাম মানুষকে জীবনের কঠিন বাস্ড়--বতার সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—***'আর পৃথিবীর বুকে যারা অশান্ড়ি সৃষ্টি করে, ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ড়'*** **(২ : ২৭)** এবং **'বস্ড়ুত তারা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে নি, বরং নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে।' (২ :৫৭)**। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের আয়াত দ্বারা অন্যায় ও পাপকে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বির"দ্ধে অপরাধ বলে বর্ণনা না করে মানুষের নিজ আত্মার প্রতি জুলুম বলেই অভিহিত করা হয়েছে।

আল- াহ সাবহানাহু ওয়া তা'আলা খেলাচ্ছলে বিশ্বব্রহ্মা" সৃষ্টি করেন নি। বরং বিশ্ব সৃষ্টির পেছনে তাঁর নিগূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে। এ উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রমাগত বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টিকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'আমি নভোম"ল, ভূ-ম"ল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নি; আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি; কিন্ড়ু তাদের অধিকাংশই বুঝে না' (৪৪ : ৩৮-৩৯)**। এ উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে সহায়ক যেকোনো আচরণ ও কাজই হচ্ছে ন্যায় ও পুণ্য; আর যেসব আচরণ ও কাজ বাঞ্ছিত (Desired) এ বিবর্তনে বাধা দেয়, সেটাই অন্যায় এবং পাপ। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য সম্পর্কে এটাই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা। এ অর্থেই আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছার ওপর আত্মসমর্পণ করা পুণ্য আর আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছার বিপরীতে কাজ করা তথা বির"দ্ধাচরণ পাপ। আবার ইসলামি নীতিতত্ত্ব অনুসারে এ একই অর্থে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই হচ্ছে পুণ্য আর তার সঙ্গে বিরোধই হচ্ছে পাপ। এক জাতি হিসেবে সব মানুষের প্রকৃতি মূলত একইরকম। কিন্ড়ু ভৌগোলিক পরিবেশের তারতম্য হেতু বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃতিগত সামান্য বৈচিত্র্য দেখা যায়। মানব প্রকৃতিগত মূল ঐক্যের দৃঢ় ভিত্তির ওপর ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ একই নৈতিক বিধান নির্দিষ্ট করেছে এবং ভৌগোলিক তারতম্যের ফলে মানব প্রকৃতিতে যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায় তার সঙ্গে মানুষের আচরণকে খাপ খাওয়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

আন্ড়র্জাতিক ক্ষেত্রে এক একটা বিশেষ সমাজ এবং জাতি যেহেতু একটি ব্যক্তির মতো, তাই আন্ড়র্জাতিক ক্ষেত্রেও একটি সামাজিক বা জাতীয় বিবেক ও নীতিবোধের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্ড়ু ইউরোপিয় জাতীয়তাবাদ কার্যত এই সামাজিক ও জাতীয় বিবেক ও নৈতিকতাকে অস্বীকার করে। 'সঙ্ঘের কোন বিবেক নেই'- এটা হলো তাদের প্রিয় স্ে- াগান। অন্য জাতির সঙ্গে আচার-আচারণের ক্ষেত্রে তারা কোনো রকম নৈতিকতা মেনে চলে না। উপরন্ড়ু তারা মনে করে যে, যেকোনো উপায়ে জাতীয় স্বার্থকে পরিতৃপ্ত করাই সর্বাপেক্ষা মহৎ জাতীয় ধর্ম। নীতিগতভাবে তারা স্বীকার করে যে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সম্পর্ক, এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির সম্পর্কের মতোই। কিন্ড়ু সমাজের এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির যেরকম ব্যবহার তারা আশা করে, নিজেরা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করে না। ভালো বা মন্দ যা-ই হোক, তাদের নিজেদের নৈতিকতার মাপকাঠিতে ব্যক্তি হিসেবে তারা মোটামুটি সৎ। কিন্ড়ু জাতি হিসেবে

বিবেচনা করলে তাদের নিজেদের নৈতিকতার মানদ"ও তাদেরকে ভয়ংকর অসৎ ও অবিবেচক বলে মনে হবে। কিন্ড়ু ইসলাম ব্যক্তি এবং জাতি এ দু'য়ের জন্যে এক ও অভিন্ন নৈতিক ব্যবস্থা তথা নীতিতত্ত্বের নির্দেশ প্রদান করে। এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির যেরকম ব্যবহার আশা করা হয় এক জাতির সঙ্গে অপর জাতিও ঠিক সে রকমই ব্যবহার করবে—এটাই ইসলামের শিক্ষা।

নিহিলীয় বা শূন্যতাপন্থি জড়বাদ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও ব্যক্তির গুর"ত্ব খর্ব করে। এ মতবাদে সমাজ-বিবেকের যে কথা বলা হয়েছে তা পারিপার্শ্বিক প্রয়োজনে অবস্থার চাপে সৃষ্টি হয়েছে এবং এটাই ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলাম ব্যক্তির ওপর সর্বাধিক গুর"ত্ব আরোপ করে। ইসলামি জীবনদর্শন অনুসারে ব্যক্তির জীবন দ্বারাই সামাজিক বিবেক সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ব্যক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তেমনই জাতির ক্ষেত্রেও নিজের স্বাভাবিক প্রয়োজন পরিতৃপ্তির অধিকার ইসলাম স্বীকার করে। তবে এ স্বীকৃতি সে পর্যন্ড়ই সীমাবদ্ধ যে পর্যন্ড় অন্যান্য জাতির অনুরূপ অধিকারের সঙ্গে তা সঙ্গতি বজায় রাখে। কিন্ড়ু শুধুমাত্র এতেই সন্ড়ুষ্ট না থেকে ইসলাম আরো মহত্তর পথ ধরে সৃষ্টির অন্যান্য জীবজন্ড়ুর প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম মেনে চলা মানুষের জন্যে বাধ্যতামূলক করে। এভাবেই ইসলাম মানব সৃষ্ট কৃত্রিম ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোধের ধারণাকে বর্জন করে মানুষের মৌলিক প্রকৃতি ভিত্তিক এমন এক সর্বজনীন নৈতিকতার শিক্ষা দেয়, যা ব্যক্তি, জাতি এবং সমগ্র বিশ্বমানবকে একইভাবে প্রভাবিত করে তাদের পরস্পরের মাঝে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করে।

মানবপ্রণীত আইন ও জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি

পূর্ব নির্ধারিত সমাজবিবেক বলতে কিছু নেই। ব্যক্তিই সমষ্টিগতভাবে সমাজের স্রষ্টা। বিবর্তন ও একীভবনের স্বাভাবিক ধারায় সমাজ-বিবেক হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তির বিবেকের সমন্বয়। কিন্ড়ু দুর্ভাগ্যবশত মানবসৃষ্ট সমাজে কিছু সংখ্যক ক্ষমতাশীল ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর বিবেক সমাজ-বিবেকের ওপর প্রাধান্য বিস্ড়ার করে এবং শেষ পর্যন্ড় একে নিয়ন্ত্রিত করে। এ ধরনের সমাজ-বিবেক প্রকৃতি বিরোধী এবং এর দ্বারা সাধারণ মানুষের কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না। এর মাধ্যমে বলবানদের ইচ্ছাই প্রতিধ্বনিত হয় এবং সেই হিসেবে এটা দুর্বলকে শোষণ করার হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানব কর্তৃক প্রণীত আইন এরূপ সামাজিক-বিবেকেরই বিধিবদ্ধ প্রতিফলন, এটা ব্যক্তির স্বাভাবিক বিবেকের প্রতিফলন নয়। এ কারণেই মানবপ্রণীত আইনের প্রতি আনুগত্য স্বতঃস্ফূর্ত নয় বরং এ আইনের প্রতি আনুগত্য আদায়ের জন্যে শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হয়। মানুষের নিজ দেহ-মনের প্রয়োজনকে পরিতৃপ্ত করার ইচ্ছা দ্বারাই তার সমস্ড় আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই পুলিশের লাঠি দিয়ে চাপিয়ে দেয়া বিধান নয় বরং মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নৈতিক বিধানই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত

আনুগত্য পেতে পারে। একথা অত্যন্ড় পরিষ্কার যে, মানবপ্রণীত কোনো আইন ও জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি মানুষের ব্যক্তিগত আচরণকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ, নিরূপণ ও গঠন করতে পারে না। এ জাতীয় আইনের স্রষ্টারা নিজেরাই আইনকে ফাঁকি দেয়ার ও এড়িয়ে চলার এমন সব পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করেন, যার ফলে আইনের প্রতি আনুগত্যহীনতা অনেকটা আইনসঙ্গত হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যক্তি আচরণকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি আইনের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী, তবে যথেষ্ট নয়। কেননা জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি শুধুমাত্র প্রকাশ্য কার্যকলাপের প্রতিই লক্ষ্য রাখতে পারে। কিন্ড়ু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের, বিশেষত যারা সাধারণ মানুষের বিবেক ও জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টিকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেইসব ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন তৎপরতা সম্পর্কে জনসাধারণের সতর্কদৃষ্টি কিছুই জানতে পারে না। এইভাবে ব্যক্তিগত আচরণ, জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি এবং বিধিবদ্ধ আইনের শাসন বৃত্তাকারে একে অপরের ওপর ক্রিয়া করতে থাকে এবং ন্যায় ও অন্যায় সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এবং বিশৃঙ্খল ধারণার সৃষ্টি করে চলে। এই অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফল এই দাঁড়ায় যে, পরিশেষে মানুষ শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে অপরিণামদর্শী হয়ে পড়ে এবং তার অহমিকাকে নিজের পথ ধরে সে পর্যন্ড় চলার অনুমতি দেয়, যে পর্যন্ড় সে সাধারণের দৃষ্টি আর আইনি দ কে এড়িয়ে চলতে পারে।

সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত আচরণকে কার্যকরভাবে মানিয়ে নিতে হলে এমন একটি শাসনশক্তির প্রয়োজন, যে শক্তি একাকি নিজের শয়ন কক্ষে শায়িত থাকা অবস্থায়ও তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সাধারণত নৈতিক তত্ত্বের অতিপ্রাকৃতিক অলৌকিক শক্তির সমর্থন কামনা করা হয় এবং এই অলৌকিক শক্তিগুলোর একটি বিশেষ গুণ ধরা হয় যে, সে সর্বজ্ঞ। শাস্ড়ি ও পুরস্কারদানের ক্ষমতার অধিকারী এসব অলৌকিক শক্তির সতর্ক দৃষ্টি সবসময়ই মানুষের চিন্ড়া ও কর্মের ওপর রয়েছে, এ বিশ্বাস মানুষের ভালো ও মন্দ কর্মকা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে নিঃসন্দেহে খুব শক্তিশালী। কিন্ড়ু তা সত্ত্বেও সেটা যথেষ্ট নয়। কেননা সব জিনিসেরই একটি সীমা রয়েছে। অলৌকিক শক্তির প্রতি মানুষের আনুগত্যেরও একটি সীমা আছে। এসব অলৌকিক শক্তিগুলো যদি সত্য না হয়, যদি অজ্ঞতা ও ভীতি থেকে এসব জন্মে থাকে, কিংবা শাসনের কৌশল হিসেবে যদি সচেতনভাবে এদেরকে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের সৃষ্ট বিধিবদ্ধ আইন এবং জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টির মতো এসব অলৌকিক শক্তিও মানুষের আনুগত্য আদায় করতে নিদার ণভাবে ব্যর্থ হবে। তাছাড়াও অলৌকিক শক্তিগুলোর আরো একটা বড় বিপদ হচ্ছে যে, তারা মানব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো নৈতিক ব্যবস্থাই নির্ধারণ করতে পারে না।

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক যেসব নিয়ম মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের সম্বন্ধে অতিলৌকিক জ্ঞান থেকে সৃষ্ট দৃঢ় ও ঐকরূপ নৈতিকতাবোধ এবং এই নৈতিকতাবোধের সঙ্গে ঐক্যহীন যেকোনো আচরণ প্রথম দৃষ্টিতে সুখকর মনে হলেও শেষ পর্যন্ড় তা

মানুষের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটায়। তবে দৃঢ় নৈতিকতাবোধের প্রতি বিশ্বাসই একমাত্র স্বাভাবিক ও চরম কার্যকর শাসনশক্তি—যা লোকালয় এবং নির্জনে ব্যক্তির শয়ন কক্ষের আচরণকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কলেমার তৌহিদি (আল- াহ এক এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করা) বিশ্বাস মানুষকে এই জ্ঞান ও বিশ্বাস দান করে আর ঘোষণা করে যে, পাপ আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বির দ্ধে অপরাধ নয়–আসলে এ হচ্ছে মানুষের নিজের সত্তার বির দ্ধে অপরাধ। পাপী নিজের ওপরই জুলুম করে অর্থাৎ নিজের আত্মাকেই উৎপীড়ন করে।

বহু দেবত্বের নীতিতত্ত্ব

কলেমা যেসব দেবদেবীকে অস্বীকার করে আসলে তারাই চরম বিশৃঙ্খলার স্রষ্টা। মানুষের কল্পনাসৃষ্ট এসব অলীক বস্ড়ুগুলি এক একজন ঐশ্বরিক সত্তার একেকটা বিশেষ প্রতীক নয় বরং তারা হচ্ছে মানুষের এক এক বিশেষ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রতীক। মানুষের বিচ্ছিন্ন চিন্ড়া থেকেই তাদের উৎপত্তি। তাই তাদের একের সঙ্গে অন্যের কোনো সামঞ্জস্য নেই। তাদের সৃষ্টিকর্তা মানুষেরা বহু রকমের মানবীয় গুণাবলী দ্বারা তাদেরকে ভূষিত করেছে। এছাড়াও মহিমান্বিত বীরপুর ষদিগকেও ঈশ্বরত্বের মর্যাদা দিয়েছে। এসব বীরপুর ষ দেবতারা আংশিক রক্ত মাংসের মানুষ আর আংশিক অবাস্ড়ব কল্পনা। সম্পূর্ণ কাল্পনিক দেবতাদের মতো এসব বীরপুর ষ দেবতাদেরকে কেন্দ্র করেও নানা গল্প ও উপকথার সৃষ্টি হয়। দেবতাদের এই সমাবেশ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র, ভিন্ন ভিন্ন আবেগ ও অনুভূতি এবং ভিন্ন র চি বিশিষ্ট পুর ষ ও নারীর সমাবেশ; তাদের প্রেম, যুদ্ধ এবং শান্ড়ি নিয়েও অনেক গল্প আছে আবার এসব দেবদেবীর রাজা এবং পুরোহিতও আছে। এসব দেবতাদের মানবীয় আচরণ ও ভুল-ভ্রান্ড়িকে ব্যাখ্যা ও খ ন করার জন্যে বহু রকমের দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর ফলে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। মানুষের সব রকমের দোষ-গুণই দেবদেবীদের সমাজে দেখতে পাওয়া যায়। এর প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে এই যে, এসব দেবদেবীকে যারা পূজা করেন তারা তাদের প্রতিবেশীদের কার্যকলাপের মধ্যে যেমন নিজেদের জন্য কোনো আদর্শ খুঁজে পান না তেমনই এসব দেবদেবীর কাছ থেকে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ পেতেও তাদের অত্যন্ড় অসুবিধা হয়। এর ফলে নৈতিক অধঃপতন ও বিভ্রান্ড়ি ঘটে। একে তারা বলে উদার নৈতিকতা। তাদের নিজেদের দোদুল্যমান মনকে প্রতারিত করতে তারা সুনির্দিষ্ট সুসংবদ্ধ জীবনদর্শনের অনুপস্থিতির মহিমা বর্ণনার জন্য নানা দর্শন সৃষ্টি করে এবং নিজেদের ধর্মের উদার নৈতিকতার জন্য গর্ববোধ করে। এজন্যে বহুদেবত্বে বিশ্বাসী সমাজে মানুষ সব সময়ই নিজের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং তার কাজের স্বপক্ষে ধর্মীয় সমর্থন লাভের জন্যে কোনো না কোনো দেবতার সাহায্য বা সমর্থন লাভ করে।

কলেমার প্রভাব

সেকালের বেদুইন আরবদের গুহায় বসবাসের জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারী-পুর ষ, শিশু সবাই মদ এবং জুয়ায় মত্ত থাকতো। মদের প্রভাব যতোই তাদের ওপর বিস্ড়ার লাভ করতো ততোই তাদের হারিয়ে যেতো মানসিক ভারসাম্য এবং দৈহিক সামর্থ্য। কোলাহল উন্মত্ত হয়ে তারা একে অপরের সঙ্গে ব্যাপৃত থাকতো ঝগড়া, ফ্যাসাদ, মারামারি ও চিৎকারে। রাত যতোই বাড়তো ততোই তাদের মদ্যপানের এবং ঝগড়া ফ্যাসাদের মাত্রাও বাড়তে থাকতো। মানব চরিত্রের যেসব উপাদান মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে রাখে, তাদের মধ্য থেকে এ সমস্ড় গুণগুলোও লুপ্ত হয়ে পড়তো। ক্লান্ড় ও অবসন্ন হয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে না পড়া পর্যন্ড় তাদের মধ্যে চলতো নির্লজ্জ লাম্পট্য এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই তারা যথারীতি বের হয়ে পড়তো তাদের দৈনন্দিন কাজে। চুরি-ডাকাতি, হত্যা ও লুটপাট ছিলো তাদের জীবনের দৈনন্দিন কাজ। মর ভূমির পথের একাকী পথিকরাই ছিলো তাদের শিকার আর এসব অপরাধ থেকে অর্জিত অর্থই ছিলো তাদের জীবনধারণের একমাত্র পথ। নিজেদের অপরাধ ও পাপের আগুন যখন তাদের দগ্ধ করতে থাকতো তখন তারা ছুটে যেতো তাদের দেবদেবীর কেন্দ্রস্থল কাবার দিকে। এসব নিকৃষ্ট লোকেরা সেখানে সমবেত হতো এবং বলি দান করে বা নৈবেদ্য প্রদান করে দেবদেবীদের কাছে নিজেদের অতীত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং ভবিষ্যতের জন্য আশীর্বাদ কামনা করতো। আরব বেদুইনদের যখন এরকম অবস্থা তখন হেরা পর্বত থেকে ঘোষিত হলো— **"আল- াহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ (সা.) আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাসুল"**। এরপর অল্প দিনের মধ্যেই কাবায় অধিষ্ঠিত সকল দেবদেবতা অপসারিত হলো এবং তাদের সঙ্গে অদৃশ্য হলো সকল নৈতিক বিভ্রম ও বিশৃঙ্খলা।

কলেমা বেদুইনদের দান করলো মানব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নৈতিকতার স্পষ্ট ও সর্বজনীন এক ব্যবস্থা। এভাবেই কলেমা তাদের চিন্ড়ার মধ্যে বিপ- ব ঘটিয়ে তাদের আচার-আচরণকে সংযত করে তাদের নৈতিকতাকে উন্নীত করে উৎকর্ষতার চরম শিখরে। এর ফলে তারা অর্জন করে তৎকালীন সভ্য জগতের অবিমিশ্র প্রশংসা। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কলেমা মহৎ করে তুললো। তাই এসব মহৎ ব্যক্তিরা সৃষ্টি করলেন একটি জীবন্ড় ও সুন্দর সমাজ। আইন যেখানে ব্যর্থ হলো, জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি ও সমালোচনা যেখানে বিফল হলো, অনিশ্চিত অতিলৌকিক শক্তি যেখানে অক্ষম হলো কলেমা সেখানেই অর্জন করলো সাফল্য। কলেমা অতীতে যেমন আরবের মর ভূমিতে বেদুইনদের নৈতিক চেতনার মধ্যে বিপ- ব ঘটিয়ে তাদের সক্রিয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলো ঠিক তেমনই কলেমার শিক্ষা—যে শিক্ষা হচ্ছে বিশ্বের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকারী

রবের শিক্ষা—আইনি শাসনের জুলুম ছাড়াই ভবিষ্যতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের গুপ্ত ও প্রকাশ্য আচরণকেও নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রিত করবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ- ব

বুদ্ধির মুক্তি

কলেমার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা বহু দেবত্বের কুসংস্কার এবং নাস্ড়িকতার অহমিকায় নিমজ্জিত বুদ্ধির মুক্তি ঘটায়। বুদ্ধি একটি জোরালো শক্তি। বুদ্ধি যদি ইচ্ছার দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকে এবং জ্ঞান আহরণের জন্যে শুধু বহিঃইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর না করে তাহলে বুদ্ধি মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। জ্ঞান আহরণের জন্যে এবং পথের দিশা লাভের জন্যে যে পর্যন্ড় বুদ্ধিকে বহিঃইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়, সে পর্যন্ড় বুদ্ধি স্বাধীন নয় এবং তাকে বিশ্বাসও করা যায় না। কিন্ড়ু সে যখন উন্নত স্বজ্ঞার (intuition) সহযোগিতা লাভ করে একমাত্র তখনই তাকে মুক্ত বলা চলে এবং সে হয় তখন নির্ভরযোগ্য।

বহিঃইন্দ্রিয়গুলো জড় বিষয়বস্ড়ু বা জড় দৃশ্যাবলী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মন ও ইচ্ছার মাধ্যমে তা বুদ্ধির কাছে প্রেরণ করে। কিন্ড়ু স্বজ্ঞা যখন কার্যকরীভাবে সতেজ ও সক্রিয় থাকে না, তখন এভাবে সংগৃহীত উপাত্তই বুদ্ধির অনুমান ও সিদ্ধান্ড়ের ভিত রচনা করে। মন সবসময় মুক্ত নয়, অধিকাংশ সময়ই সে অহমিকা কিংবা পরার্থপরতার ইচ্ছা শক্তির দাস। অহমিকা ও পরার্থপরতার মধ্যে সংগ্রামে যখন অহমিকা প্রাধান্য লাভ করে তখন মন অহমিকার নির্দেশ পালন করে। আবার সংগ্রামে যখন পরার্থপরতা জয়ী হয় তখন মন পরার্থপর প্রবণতার নিয়ন্ত্রণে আসে। অহমিকা ও পরার্থপরতার মধ্যে যখন শান্ড়ি স্থাপিত হয় একমাত্র তখনই মন মুক্তি লাভ করে। অহমিকা ও পরার্থপরতার মধ্যে যে পর্যন্ড় সংগ্রাম চলতে থাকে সে পর্যন্ড় জড়জগৎ থেকে সংগৃহীত ও বুদ্ধির কাছে প্রেরিত তথ্যসমূহ অহমিকা ও পরার্থপরতার মধ্যে যখন যে শক্তিশালী থাকে তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও বিকৃত হয়।

মন যখন বহিঃইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাদের অনুভূতি লাভের স্বাধীনতা থাকে না। মন না চাইলে চোখ দেখতে পারে না। শুধু তাই নয় মন চোখকে যতোটুকু দেখার অনুমতি দেয়, ততোটুকু মাত্রই চোখ দেখতে পায়। অনুরূপভাবে মনের ইচ্ছে না থাকলে কানও তা দ্বারা যতোটুকু শোনা সম্ভব, ততোটুকু শুনতে পায় না। অপরাপর ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে এই একই অবস্থা। বহিঃইন্দ্রিয়ের এই সীমাবদ্ধতাকে সাধারণত অন্যমনস্কতা বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্ড়ু প্রকৃতপক্ষে বহিঃইন্দ্রিয়গুলোকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে গিয়ে মন যে একাগ্রতা ও সতর্কতার অবলম্বন করে, এটা হচ্ছে তারই ফল।

মন ইচ্ছার আদেশে কাজ করে, আর ইচ্ছা কাজ করে অবস্থাভেদে অহমিকা ও পরার্থপরতার আদেশে। সুতরাং মনের আদেশ অনুসারে বহিঃইন্দ্রিয়গুলো তথ্যসংগ্রহ

করে, ইচ্ছার অভিলাষ অনুযায়ী মন এগুলোকে এক সঙ্গে গেঁথে একটা সুষ্ঠুরূপ দান করে। এরপর অহমিকা কিংবা পরার্থপরতা যেকোনো এক প্রভুর বাসনা অনুযায়ী তার আত্মমুখী বিবেক ও ধ্যানধারণা গড়ে তোলে। তারপর এভাবে গঠিত বিবেক ও ধারণাকে তাদের গঠনকারী উপাদানসহ বুদ্ধির কাছে প্রেরণ করে। এসব আত্মমুখী তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অসহায় বুদ্ধি অনুগত ভৃত্যের মতো বিভিন্ন মতবাদ ও নীতি সূত্রাকারে প্রকাশ করে। তাই বুদ্ধি মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। এভাবে অহমিকা যখন ইচ্ছা শক্তির ওপর প্রাধান্য বিস্ড়ার করে এবং হত্যা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা প্রভৃতি কু-কর্মের সমর্থন চায়, তখন বহিঃইন্দ্রিয়, মন, ইচ্ছা, বুদ্ধি ইত্যাদি মানুষের এসব বৃত্তিগুলো অহমিকার কাজের স্বপক্ষে তাদের সমস্ড় ক্ষমতাকে নিয়োজিত করে এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সমর্থনে একটি জীবন দর্শন গড়ে তোলে। একইভাবে পরার্থপরতা যখন ইচ্ছের ওপর আধিপত্য বিস্ড়ার করে তখন বুদ্ধি পরার্থপরতার নির্দেশ অনুসারে অসংযত দান ও ক্ষমার স্বপক্ষে অন্য একটি মতবাদ উদ্ভাবন করে। এ সমস্ড় নীতিতত্ত্ব হচ্ছে একেবারে আত্মমুখী ও অবাস্ড়ব। কিন্ড়ু স্বজ্ঞা যখন উৎকর্ষিত হয় এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সাহায্যে বস্ড়ু সম্পর্কে অর্জিত বিষয়মুখী জ্ঞান বুদ্ধির কাছে পাঠায় একমাত্র সেক্ষেত্রেই বুদ্ধি এ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে নিজের একটা স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। স্বাধীন বুদ্ধি মানুষের স্বার্থপর ও পরার্থপর প্রবণতার ওপর প্রাধান্য বিস্ড়ার করে এবং তাদের মধ্যে শান্ড়ি স্থাপন করে। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার মধ্যে শান্ড়ি ও ঐক্য স্থাপিত হলে ইচ্ছার আর কোনো অস্ড়িত্ব থাকে না এবং তখন মনের উপলব্ধি ও বুদ্ধির ধারণা শক্তি হয় ইচ্ছাহীন বা বিষয়মুখী। তখন বুদ্ধি, মন ও বহিঃইন্দ্রিয়সমূহ একে অন্যের পূর্ণ সহযোগিতায় নিরপেক্ষভাবে কাজ করে। একমাত্র সেই সময়ই মানুষের মুক্তবুদ্ধি হয় জ্ঞান ও সত্য অন্বেষণের উপযোগী।

ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় ইচ্ছাকে বলা হয় "অহংকার"। কান্ট যাকে 'বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা' বলে অভিহিত করেছিলেন, বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক সুফেনহোর তাকেই বলেছেন 'ইচ্ছাহীন চিন্ড়া'। সত্যের নির্ভুল ধারণা ও উপলব্ধির জন্যে শুধু দৃষ্টি শক্তিই নয়, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রয়োজন। একমাত্র নিজস্ব সত্তা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে সত্যিকারের জ্ঞান থেকে এটা অর্জন করা সম্ভব। আমি কোথা থেকে এসেছি, কোথায় আছি, আর কোথায় যাব, এসবই হচ্ছে দর্শনের গুর"ত্বপূর্ণ ও চরম জিজ্ঞাসা। এসব প্রশ্নের সমাধানের নির্ভুল উপায় খুঁজে পেতে হলে ইচ্ছা বা 'অহংকার' এর প্রভাবমুক্ত অনুভূতি, উপলব্ধি ও ধারণা শক্তির যন্ত্রগুলোর সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার দরকার। সৃষ্টির আদি ও অন্ড় এক আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অস্ড়িত্ব ঘোষণা করে কলেমা ব্যক্তির ইচ্ছার অপসারণ দাবি করে অর্থাৎ আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছার কাছে ব্যক্তির ইচ্ছার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ দাবি করে। যার চতুর্দিকে বিশ্বব্রহ্মা" আবর্তিত হচ্ছে কলেমা আমাদেরকে সেই কেন্দ্রের সীমানা পরিচয় করিয়ে দেয় এবং এইভাবে 'অহংকার' বা আত্মমুখীতার অপসারণ করে অনুভূতি, উপলব্ধি ও ধারণা শক্তির সমন্বিত কর্মক্ষেত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণকে 'নিষ্কাম কর্ম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কর্ম বলতে শুধু দৃশ্যমান ক্রিয়া কর্মই বোঝায়

না, চিন্ড়া ও অনুভূতিও এর অন্ড়র্গত। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ওপর বিশ্বাসের দুর্বলতা বা অভাব ক্রমশ মানুষের মাঝে আত্মমুখীতাকে জাগ্রত করে প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে একটা আবরণ সৃষ্টি করে এবং পরিশেষে মানুষকে সম্পূর্ণ অন্ধ করে দেয়। অজ্ঞতার এই পর্দাকে বেদানন্ড়বাদীরা বলেন 'অবিদ্যা' বা 'জ্ঞানহীনতা' আর বুদ্ধরা বলেন 'মায়া'। শক্তিশালী আদ ও সামুদ জাতির পতনের কথা উলে- খ করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'এবং আমি তাদের এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদের ক্ষমতা দেই নি। আমি তাদের দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়, কিন্ড়ু এগুলো তাদের কোনো কাজে আসলো না, যখন তারা আল- াহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করলো এবং তাদের সেই শাস্ড়ি গ্রাস করে নিলো, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো'** (৪৬ : ২৬)।

জ্ঞানপিপাসা

একজন নিরক্ষর আরব হজরত মুহম্মদ (সা.) তাঁর প্রেরণার মুহূর্তে যা উচ্চরণ করেছিলেন তাতেই সেকালের মর ভূমির অশিক্ষিত সন্ড়ানদের পরিণত করেছিলো তৎকালীন সমাজের শিক্ষাগুর তে। অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক রূপান্ড়রই তাদের করে তুলেছিলো মহিমান্বিত। কলেমা তাদের এ জ্ঞান দান করলো যে, সে একমাত্র আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করবে না এবং তিনি ছাড়া কারো কাছে সাহায্য চাইবে না। পৃথিবীতে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে সে-ই সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ এবং সৃষ্টির বাকি সবকিছু তার আজ্ঞাধীন। সে জানলো যে, সে যখন সৃষ্টিকর্তার সামনে মাথা নত করে তখন সৃষ্টির আর সবকিছুও সৃষ্টিকর্তার সামনে মাথা নত করে এবং বেহেশত থেকে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আশীর্বাদ তার ওপর বারিধারার মতো বর্ষিত হয়। সেকালের মহান আরব সন্ড়ানেরা চারিদিকে তাকিয়ে সৃষ্টি জগতের মনোমুগ্ধকর শোভা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গভীর কৃতজ্ঞতায় আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা কীর্তন করে। আকাশের অগণিত তারকা, চন্দ্র, সূর্য এবং পৃথিবীর নানা বর্ণে রঞ্জিত গাছপালা, জীবজন্ড়ু, পাহাড়-পর্বত, নদনদী ও সাগর-মহাসাগর মানুষকে তার ভাগ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

তার মনে সদা ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয় স্রষ্টার উদাত্ত বাণী— **"আল- াহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ (সা.) আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাসুল'**। এভাবে দেখা যায়, একদিন আগেও যে ছিলো প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের দাস, যার সার্বক্ষণিক চিন্ড়া ছিলো এসব প্রভুর ক্রোধকে কীভাবে প্রশমিত করা যায়, সে-ই আজ পরিণত হলো তাদের প্রভুতে আর এসব প্রাকৃতিক শক্তিগুলো হলো তাদের দাসানুদাস। প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদ সম্পর্কে কলেমা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির এভাবেই ঘটালো পরিবর্তন। এখন থেকে শুর হলো তার নতুন চিন্ড়া—কীভাবে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে নিজের সুখশান্ড়ি এবং জীবনসংগ্রামে আনন্দ লাভের জন্যে ব্যবহার করা যায়।

প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে মানুষের উপকারে ব্যবহার করতে হলে এর একমাত্র পথ হচ্ছে এসব শক্তির রহস্য উদ্ঘাটন করা এবং এসব প্রাকৃতিক শক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা—একথা বুঝার জন্যে খুব বেশি স্বজ্ঞা বা গভীর অন্ড়র্দৃষ্টির প্রয়োজন নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৈদ্যুতিক শক্তিকে মানুষের উপকারে লাগাতে হলে বিদ্যুতের প্রকৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ও প্রণালিবদ্ধ জ্ঞান না-হলে চলে না। সুতরাং জ্ঞান আহরণ করা কলেমার বিশ্বাসের অন্যতম অঙ্গ। অন্ধকারের কাছে আলো যেমন, অজ্ঞতার কাছে কলেমার বিশ্বাসও ঠিক তেমন। তাই কলেমা মানুষের মনে সৃষ্টি করে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের পিপাসা। যে জ্ঞান আহরণে অমনোযোগী সে কলেমার শিক্ষার প্রতিও অমনোযোগী। তাই যে সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের জ্ঞান আহরণ করার অধিকার ও সুযোগসুবিধা দান করতে পারে না, তাকে মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্র বলা যায় না। রাসুলুল- াহ (সা.) বলেছেন—**'জ্ঞান আহরণ করা প্রত্যেক নরনারীর জন্য ফরজ বা বাধ্যতামূলক'**। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন—**'জ্ঞান আহরণের জন্যে প্রয়োজন হলে চীন দেশে যাও'**। এরপরও তিনি তাঁর অনুসারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতাকে প্রসারিত করার জন্যে বলেছেন—**'তোমরা বিশ্ব পরিভ্রমণ কর'**। নিজেদের স্বভাবসুলভ অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণেই হোক কিংবা তাদের প্রতিবেশিদের অজ্ঞতার ওপর নিজেদের প্রাধান্য বিস্ড়ারের জন্যেই হোক, ইসলামের তথাকথিত বিদ্বান ধর্মবিদরা মুক্ত জ্ঞান আহরণের বির দ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তারা বলেন:'জ্ঞান আহরণ করার অর্থ শুধু ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা'। কিন্ড়ু তারা ভুলে যান যে, রাসুলুল- াহ (সা.) যখন তাঁর অনুসারীদের জ্ঞান আহরণের জন্যে সুদূর চীন দেশে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন সে দেশে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দানের জন্য কোনো বিদ্যাপীঠ ছিলো না। আধুনিক বিশ্বের তথাকথিত মুসলিম জাতিসমূহের বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতার জন্যে এ ধরনের মানসিকতাই প্রধানত দায়ী। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের কাছে কলেমা শুধু মৌলিক স্বীকারোক্তি ছিলো না, তাদের কাছে কলেমা ছিলো শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই বেঁচে থাকার বাস্ড়ব উপায়। কলেমার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েই আরবরা জ্ঞান আহরণের জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান; জ্ঞান আহরণ তাঁদের নিকট হয়ে দাঁড়ায় এক মুখ্য আকর্ষণ। জ্ঞান আহরণে আরবরা পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সবদিকেই। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউকে জয় করে তাঁদের জাহাজ জ্ঞানের লেনদেনের জন্যে তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে যায় দেশ থেকে দেশান্ড়রে। তাঁদের মুক্তবুদ্ধি তাঁদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করলো এবং এর ফলে তাঁরা সকল কুসংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে দিতে সক্ষম হলেন। গ্রিকদের লুপ্ত জ্ঞানভা ারকে তাঁরা এমনিভাবেই উদ্ধার করলেন, যেমন করে ইউরোপের শ্বেতকায় জাতিরা উদ্ধার করেছিলো প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানকে। আরবরা সক্রেটিস, পে- টো ও এরিসটোটলের গ্রন্থাদি তাদের নিজের ভাষায় অনুবাদ করে গ্রিকদের সঞ্চিত জ্ঞানভা ার সকলের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন। তারা শুধুমাত্র নিজেরা জ্ঞান লাভ করেই সন্ড়ুষ্ট থাকলেন না বরং অপরকে জ্ঞান আহরণে সাহায্য করাও তারা তাদের কর্তব্য বলে মনে করলেন। এভাবে তারা মহৎ প্রতিভাবান

লেখক সৃষ্টি করে দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের এক বিরাট সমাবেশ ঘটালেন, আর এরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে মানুষের চিন্ড়া, অনুভূতি ও কর্মে বৈপ- বিক পরিবর্তন সাধন করলেন। তারা নতুন বহু কিছুর উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করেন এবং শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের সকল বিভাগে মৌলিক অবদান রাখেন। আর এসবের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুউচ্চ মিনার।

প্রাচ্যের অন্ধকারাচ্ছন্নতা

মুসলিম জাতিসমূহের সুলতান ও ধর্মতত্ত্ববিদরা নিজেদের স্বার্থে ইসলামকে নানাভাবে ব্যবহার করেছেন। তাদের অনৈসলামিক সাম্রাজ্য বিস্ড়ার, শোষণ-শাসন, মানুষের ওপর জুলুম-নির্যাতন এবং কলেমার শিক্ষার প্রতি উদাসীনতাই ইসলামের সৌধকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়ার জন্যে একমাত্র দায়ী। নির্মম নিপীড়ন সহ্যের মাধ্যমে তারা যা অর্জন করেছিলেন, তা-ই তারা হারিয়ে ফেললেন সোনার গালিচায়। তাদের সাম্রাজ্যের প্রাচুর্যের মধ্যে তারা ভুলে গেলেন ইসলামের অগ্রদূতদের সংগ্রাম ও ত্যাগের শিক্ষা। তাদের বিজয়, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং প্রগতির বহু বাহ্যিক প্রকাশ সত্ত্বেও তাদের দ্রুত অবনতি ঘটলো এবং তাদের মধ্যে দেখা দিলো ক্ষয়ের সুস্পষ্ট লক্ষণ। অন্যদিকে কনস্টানটিনোপলের পতন পাশ্চাতের জাতিসমূহের জন্যে হয়ে দাঁড়ালো এক প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ।

আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কর্মপদ্ধতি বড় রহস্যময়। পবিত্র কুরআনে বজ্রকণ্ঠে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন—**'বলুন, হে আল- াহ! তুমি সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর' (৩:২৬)।** মানুষের কর্মের ফলাফলের মধ্যেই আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আনন্দ আর মানুষ নিজেই তার ভাগ্যের স্থপতি। কলেমার প্রতি বিশ্বাস হারানোর ফলেই মুসলমানদের অধঃপতন ঘটেছে। স্বীকৃতি দিয়েই হোক আর না দিয়েই হোক, ইউরোপের জাতিসমূহ কলেমার অন্ড়র্নিহিত জীবনীশক্তিকে তাদের চিন্ড়া ও কর্মের দিশারি হিসেবে গ্রহণ করার পর থেকেই বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। আমরা জানি কনস্টানটিনোপলের পতনের পর গ্রিসের একদল পাদরি ও মনীষীর ইউরোপে প্রবেশের ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়; শুর হয় ইউরোপে রেনেসাঁ। দামেস্ক, বাগদাদ, আলেকজান্দ্রিয়া ও কর্ডোভা থেকে জ্ঞানের কেন্দ্রসমূহ স্থানান্ড়রিত হলো লন্ডন, প্যারিস ও বার্লিনে। যন্ত্র-দেবতা ইউরোপে খুঁজে পেল তার উপযুক্ত দেবালয় এবং ভক্ত পূজারী। সেসব দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হলো এবং এর পরপরই শুর হলো ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি। প্রাচ্য পরিণত হলো পাশ্চাত্যের উত্তম চারণক্ষেত্রে। রাজনৈতিক কারণে আধুনিক জ্ঞানের শ্বেতাঙ্গ অভিভাবকগণ সম্পূর্ণ অসাধুভাবে প্রাচ্যকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখলেন। যদিও জ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অবদানই ইউরোপীয়দের আধুনিক জ্ঞান-

বিজ্ঞানের ভিত্তি তবু ইউরোপীয় পন্ডিতেরা তাদের দম্ভ ও অহমিকা বশত জ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবদের অবদানকে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে রেখেছেন। তারা যেভাবে প্রাচ্যের কাঁচামাল লুট করে নিয়ে আকর্ষণীয় শিল্পজাত দ্রব্য প্রাচ্যকে উপহার দেন, ঠিক সেভাবেই প্রাচ্যের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তা স্বীকার না করে শিক্ষাগুর'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রাচ্যবাসীকে জ্ঞান বিতরণ করতে লাগলেন।

হায়রে শ্বেতকায় জাতিদের দম্ভ! বর্তমানকালের কলেজ পাশ করা প্রায় প্রত্যেক লোকই বলবে, সক্রেটিস, পে- টো এবং এরিসটোটলের পরে দক্ষ মেকিয়াভেলীই রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে প্রথম মৌলিক চিন্ড়াবিদ এবং চ্যান্সেলর বেকনই প্রথম দার্শনিক। ইউরোপের পাঠ্যপুস্ড়কসমূহের কোথাও আল ফারাবী, ইবনে আরাবি, গাজ্জালী বা ইবনে খালদুনের মতো অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের উলে- খ পাওয়া যায় না। কিন্ড়ু এরিসটোটল থেকে মেকিয়াভেলীর যুগ পর্যন্ড় প্রায় দু'হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছে। পশ্চিমা পন্ডিতদের মতে এই মধ্যবর্তীকালীন সময় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করেছে। স্পেনসার ও মার্কস-এর সমাজতত্ত্বের কথা এবং ইতিহাসের সামাজিক ব্যাখ্যার কথা আমরা প্রতিনিয়তই শুনে যাচ্ছি কিন্ড়ু গাজ্জালী বা ইবনে খালদুনের কথা আমরা শুনতে পাই না। তবে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীগণ স্বীকার কর'ক বা না-ই কর'ক, আমরা বিশ্বাস করি ইবনে খালদুনই হচ্ছেন সমাজতত্ত্ব এবং ইতিহাসের সামাজিক ব্যাখ্যার জনক।

যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত

জ্ঞান ও পান্ডিত্যের ক্ষেত্রে আরবদের যা কিছু অর্জন তার সবটুকুই কলেমার শিক্ষার সৃষ্টি। বহুদেবত্ববাদ মানুষের মাঝে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্ম দেয়, মানুষের মর্যাদাকে হীন থেকে হীনতর করে এবং প্রাকৃতিক শক্তির কাছে তার মাথাকে নত করে। বহুদেবত্ববাদী সমাজে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে প্রকৃতির রহস্য জানা মানুষের প্রয়োজন হয় না, শুধু দেবদেবীর আশীর্বাদ কামনা করলেই কর্তব্য শেষ হয়। বিদ্যাদানের জন্যে একজন নির্দিষ্ট দেব বা দেবী থাকা সত্ত্বেও বহুদেবত্ববাদ কুসংস্কারকে এতোই উৎসাহিত এবং তীব্র করে তোলে যে, তার ফলে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি অন্ধ হয়ে যায় এবং জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা নষ্ট হয়ে যায়। এখানে উলে- খ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ভারতের প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কেউই বহু দেবত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না বরং বুদ্ধ-পরবর্তী যুগেই ভারতে বহু দেবপূজা প্রসার লাভ করে।

অপরদিকে নাস্ড়িকতাবাদ জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বজ্ঞা তথা স্বতঃলব্ধ জ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। স্বজ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধির উপরই নাস্ড়িকতা পুরোপুরি নির্ভরশীল। নাস্ড়িকতাবাদে স্বজ্ঞার কোন চর্চা করা হয় না, ফলে স্বজ্ঞা থেকে কোনো নির্দেশ না পেয়ে বুদ্ধি তার নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে এবং তার নিকটতম জড় পরিবেশের দাসে পরিণত হয়। এরকম অবস্থায় বুদ্ধি মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে দিয়ে তাকে যন্ত্রে

পরিণত করে। সে তার নিজের কামনার রঙিন চশমার মধ্য দিয়ে সবকিছুকে দেখে। এ রকম বুদ্ধি শুধু অন্ধ প্রকৃতিকে দেখে, সে দেখতে পায় না প্রকৃতির সচেতন স্রষ্টার কর্মকা"কে। এ যেন ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকের অভিনয়। সে ব্যাকরণ জানে কিন্ডু ভাষা জানে না।

কলেমা মানুষকে এ বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দেয়। কলেমা মানুষকে সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টজগৎ এবং তার নিজের সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি মানুষের আনুগত্য এবং মানুষের প্রতি সৃষ্টির অন্য সবকিছুর আনুগত্য, কলেমার এই শিক্ষা মানুষকে তার সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং বহুদেবত্ববাদ ও নাস্ড়িকতাবাদ এই দু'চরম মতবাদের মধ্যবর্তী উজ্জ্বল পথের নির্দেশনা দান করে। অতিপ্রাকৃতলব্ধ জ্ঞানের ওপর বিশ্বাসকে জোর দিয়ে কলেমা স্বজ্ঞার উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধনের প্রয়োজনের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রকৃতির রহস্য সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভের পথের সন্ধান দেয়। তাই মানুষকে আপন মনে গভীরভাবে চিন্ড়া করতে হবে ও ধ্যান করতে হবে, তা'হলেই সে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারবে। আর এভাবে অর্জিত জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ তার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে সানন্দে এগিয়ে যেতে পারবে। মনে রাখতে হবে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছ থেকেই সে এসেছে এবং তাঁর কাছে তাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।

শিক্ষার দর্শন

আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, প্রকৃতি এবং সৃষ্টির বাকি সবকিছুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে কলেমা মানুষকে তার নিজের 'ফিতরাত', সৃষ্টিরাজ্যে তার মর্যাদা এবং তার অপরিসীম সম্ভাবনার সঙ্গে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়। নিজের সম্বন্ধে এই জ্ঞান ও সচেতনতা মানুষের মধ্যে আল- াহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি, তার নিজের প্রতি এবং সৃষ্টির অন্য সকল জীবের প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের বিকাশ ঘটায়। যদি সততা ও দক্ষতার সঙ্গে মানুষকে তার এ ত্রিবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে তার মানবিক গুণাবলীর সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের প্রতি মানুষকে গুর"ত্ব আরোপ করতে হবে, আর এটাই হবে তার শিক্ষার দর্শনের আসল ভিত্তি।

যে শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের সুষম বিকাশের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে চায় এবং মানবিক গুণাবলীর অধিকাংশ দিকগুলোকে উপেক্ষা করে একটি বা মুষ্টিমেয় কয়েকটির অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে উৎসাহ দান করে বা সহায়তা করে, সে শিক্ষাব্যবস্থা কলেমার বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়বস্ড়ুর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে না কেননা এরকম জীবনদর্শন কলেমার বাণী সম্পর্কে নিদার"ণ অজ্ঞতার পরিচয় দেয় এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সফল করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

সাধারণভাবে বলা যায়, সভ্য জগতের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রধানত মস্ড়িষ্ক ও বুদ্ধির ওপরই গুর"ত্ব দেয়া হয়। তাই এসব শিক্ষাব্যবস্থার অবিমিশ্র ফল এই যে, সৃষ্টি জগতে জীব হিসেবে মানুষের মধ্যে দ্র"ত বিকৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ আমরা জানি শিক্ষাই মানুষকে গড়ে তোলে। জীবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার, অব্যবহার ও অপব্যবহার সকল জীবের তথা জাতি ও প্রজাতির উন্নতি বা অবনতির জন্যে দায়ি, এটা হচ্ছে বিবর্তনবাদের সর্বসম্মত নীতি। মানুষের মস্ড়িষ্কের বহুল ব্যবহারের ফলে বিবর্তনের ধারায় দিন দিন তার উৎকর্ষ সাধন ঘটছে অপরদিকে তার দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অব্যবহার বা অল্প ব্যবহারের ফলে দিন দিন তাদের শক্তি ও তেজস্বীতা হারিয়ে ফেলছে। শিক্ষার আধুনিক অভিভাবকেরা মানুষের বহু সংখ্যক ইন্দ্রিয় ও বৃত্তির ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাই মানুষের চোখের আড়ালে অবস্থিত এসব ইন্দ্রিয়সমূহ কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং কীভাবে এসবের বিকাশ সাধন করতে হয় তাদের শিক্ষাপদ্ধতি তা শিক্ষা দেয় না কিংবা শিক্ষা দিতে পারে না। অব্যবহারের ফলে তাই এসব ইন্দ্রিয়সমূহ ধীরে ধীরে অকার্যকর হয়ে পড়ে। দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থূল ইন্দ্রিয়গুলোকে যে উদ্দেশ্যে বা যে কাজের জন্যে তৈরি করা হয়েছিলো সেভাবে তাদের শিক্ষিত করে তোলা হয় না, পক্ষান্ড়রে তাদের এমন প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যেন তারা নিজেদের অনুপযুক্ত ও অস্বাভাবিক কাজে লাগায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দাঁত তৈরি হয়েছিলো হাড়, সুপারি প্রভৃতি শক্ত খাদ্যবস্ড়ু চূর্ণ ও পেষণ করার জন্যে, অতিমাত্রায় সিদ্ধ নরম খাদ্যবস্ড়ু চর্বণ করার জন্যে নয়। সুতরাং এগুলোর অবনতির কারণ তাদের অপব্যবহার।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি বড় ত্র"টি হচ্ছে, এ ব্যবস্থা মানুষকে ভয়ানকভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তোলে। বর্তমান সমাজতন্ত্রের যুগে বা মানুষের জীবনব্যবস্থাকে সামাজিকরণের যুগে প্রথম দৃষ্টিতে একে কালের (সময়ের) সঙ্গে অসঙ্গতি বা স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে, কিন্ডু তা সত্ত্বেও এটাই বাস্ড়ব। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের তেমন কোনো বাহ্যিক নৈতিকতা জ্ঞান নেই। কোন ব্যক্তি, শ্রেণী কিংবা জাতির তাৎক্ষণিক স্বার্থরক্ষা এবং অগ্রগতির জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তার কাছে সেটাই নৈতিকতা। বর্তমানে মানুষের পরার্থপর প্রবণতার প্রাথমিক বিকাশক্ষেত্র পারিবারিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে কলুষিত করা হয়েছে, তাই এখন পুত্র তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার বিশেষ যত্ন নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। মানুষের মানবিক গুণাবলীর ক্রমাবনতির ফলে তার পাশবিক প্রবৃত্তিগুলো অবিচলিতভাবে দ্র"তগতিতে বেড়ে চলছে।

পশ্চিমা ধনতন্ত্রী এবং সমাজতন্ত্রীরা মোটা বুদ্ধিসম্পন্ন, আত্মমুখী বুদ্ধি এবং স্বার্থপর নৈতিকতাসম্পন্ন এমন এক ধরনের জীব, যাদের মধ্যে মানবেতর জীবজন্ড়ুদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও সহজাত প্রবৃত্তিরও প্রায় সবগুলিই অনুপস্থিত। জড়বাদী পাশ্চাত্য জগতের ধনতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে, সমাজতন্ত্রীরা দলবদ্ধ জীব যাদের একমাত্র চিন্ড়া নিজেদের দলের কল্যাণ সাধন; অপরদিকে ধনতন্ত্রীরা হচ্ছেন সর্প ও সরীসৃপের মতো ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীব, যারা একা একা অথবা জোড়ায় জোড়ায়

চলাফেরা করে। নিজেদের অথবা নিজ জোড়ার (সঙ্গীর) কল্যাণ সাধনই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

জাপানের পাঁচ 'এইচ' বিশিষ্ট মৌলিক শিক্ষা মানুষের সার্বিক বিকাশের অনেকটা বাস্ড়ব প্রচেষ্টা। 'পাঁচ' এইচ বলতে হেলথ (স্বাস্থ্য), হ্যা¯ (হাত), হ্যাড (মাথা), হার্ট (হৃদয়) এবং হ্যাভেন (স্বর্গ)-এই পাঁচটি বিষয়কে বুঝায়। তাৎক্ষণিক সুবিধা লাভের উন্মত্ততাহেতু মানুষ প্রায়ই এমন সব শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করে যার ফলে শেষ পর্যন্ড় মানুষের অত্যাবশ্যক অনেক ইন্দ্রিয় ও বৃত্তির স্থায়ী ক্ষতিসাধন ঘটে। 'অ্যাসপিরিন' জাতীয় কোনো কোনো ঔষধ কতকগুলো বিশেষ রোগের উপশমে চমৎকার কাজ করে। কিন্ড়ু তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হৃৎপি¯, ফুসফুস কিংবা শরীরের বহু অপরিহার্য অঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্ড় করে। এসব ক্ষেত্রে রোগের চেয়ে রোগমুক্তির জন্যে ব্যবহৃত ঔষধের প্রভাব অধিকতর মারাত্মক। অবৈজ্ঞানিক ও অস্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থাও একইভাবে মানুষের ভাগ্যকে ক্ষতিগ্রস্ড় করে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে বিনষ্ট করে দেয়।

সাক্ষরতা জ্ঞান এবং পাঠ্যপুস্ড়ক থেকে আহরিত জ্ঞান শিক্ষার একটা সামান্য অংশমাত্র। মানুষ তার আসল শিক্ষা লাভ করে তার জীবন ও জীবিকার বাস্ড়ব পরিবেশ থেকে। সুতরাং মানুষের জীবনব্যবস্থার মান থেকেই তার শিক্ষার মান নির্ধারিত হয়। জীবন যেহেতু একটি অখ¯ সত্তা, তাই মানুষের শিক্ষা সুস্থ হতে পারে না যদি তার জীবনের এক বা একাধিক দিক অসুস্থ থেকে যায়। সুতরাং কলেমার শিক্ষার দর্শনকে এই অখ¯ সত্তার সঙ্গে পরিপূরক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এই অখ¯ সত্তার অবশ্যই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজ বিপ- ব

তমসার যুগ

বহুদেবত্ববাদ মানুষে মানুষে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্যকে উৎসাহিত করে। দেবতাদের সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নেই। তাদেরও কেউ পুর¯ষ, কেউ নারী, কেউ রাজা, কেউ প্রজা, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র এবং কেউ শক্তিমান, কেউ দুর্বল। প্রাথমিক দিকে দেবতাদের এই সমাজ ছিলো মানবসমাজেরই হুবহু প্রতিচ্ছবি। কিন্ড়ু পরবর্তী কালে এসব দেবতারা যখন মানুষের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন তারা মানুষের কাজকর্মে তাদের ছায়াপাত করতে শুর¯ করলো এবং পূর্ব থেকে বিদ্যমান মানুষে মানুষে বৈষম্যকে পরিণত করলো সামাজিক জীবনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে।

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মতো আরবের মানুষেরাও অসংখ্য পরিবার ও গোত্রে বিভক্ত ছিলো। আর এসব পরিবার ও গোত্র একে অন্যের সঙ্গে বিরামহীনভাবে পারিবারিক ও গোত্রীয় সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো। একই পরিবার ও গোত্রের মানুষের মধ্যেও একের সঙ্গে অন্যের যথেষ্ট সামাজিক বৈষম্য ছিলো। সমাজের ভাগ্যবান সম্পদশালী লোকেরা উঁচু সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতো এবং গোত্র প্রধানদের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনেরাও ছিলেন সামাজিক মর্যাদায় সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ। সমাজের মধ্যে পেশাগত বৈষম্যও বিরাজ করতো। দেবতাদের পুরোহিতগণই ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের প্রধান ধর্মগুর¯; তাই তারা বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতেন এবং শ্রমিক শ্রেণীর মানুষকে তারা তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে হেয় দৃষ্টিতে দেখতেন।

সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধারণা আরবদের কাছে এতোই অপরিচিত ছিলো যে, খুব অল্প উত্তেজনার বশেও ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরি চালাতে দ্বিধাবোধ করতো না। নারী ও পুর¯ষের সামাজিক সমান মর্যাদার প্রশ্ন দূরে থাক আরব সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদাই ছিলো না। সে সমাজে নারীরা ছিলো তাদের অস্থাবর সম্পত্তির মতো। ক্রীতদাস-দাসীকে গণ্য করা হতো ভারবাহী পশুরূপে। পশুর ওপর অত্যাচার বর্তমানে মানুষের মনে যে পরিমাণ অনুকম্পা জাগিয়ে তুলে ক্রীতদাসদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারও তখন স্বাধীন মানুষের মনে সে পরিমাণ অনুকম্পা জাগাতে পারতো না। এসব অসাম্যকে ভাগ্যের লিখন ও দেবতাদের বিধান বলে চাপিয়ে দেয়া হতো এবং এসব সামাজিক অন্যায় অবিচারগুলো ধর্ম ও দর্শনের সমর্থন এবং অনুমোদন লাভ করতো।

ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জাতিভেদ প্রথার মধ্যে আজও এসব সামাজিক বৈষম্যের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা তো দূরের কথা, এমনকি তারা তাদের ছায়াও মাড়াতে চায় না। একজন ব্রাহ্মণ

পুরোহিতের পালিত কুকুর একজন নিম্নশ্রেণীর লোকের চেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদা পায়। জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদের জন্যে ভারতীয় পন্ডিতদের যথেষ্ট প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ড় এ বিষয়ে বিশেষ কোনো সাফল্য অর্জিত হয় নি। এখানে উলে- খ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ভারতের 'বর্ণাশ্রম' ও বর্তমানকালে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা মোটেও এক জিনিস নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে—'কর্ম ও গুণের ওপর ভিত্তি করে আমি চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেছি।' বর্ণ অর্থ শ্রেণী, জন্মগত জাতি নয়। 'গুণ' অর্থ বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা এবং 'কর্ম' অর্থ বিভিন্ন রকমের প্রশংসনীয় কার্য ও কর্মতৎপরতা। এর থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মানুষকে চার জাতিতে বিভক্ত না করে ব্যক্তিগত রুচি, প্রবৃত্তি, দক্ষতা ও বৃত্তি অনুসারে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। আর এ ভাগ সম্পূর্ণ প্রকৃতি সঙ্গত। যারা ছিলেন সৎ ও নিষ্ঠাবান এবং বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করার মতো যাদের ছিলো প্রতিভা, তাদের বলা হতো ব্রাহ্মণ। তারা শিক্ষা লাভ করতেন এবং শিক্ষাদান করতেন, গুরু বা শিক্ষক হিসেবে এরা সমাজে লাভ করতেন সর্বাধিক সম্মান। যারা দৈহিক শক্তিতে পরাক্রম অর্জন করতেন, তারা হতেন রাজা। রাজা, রাজনীতিবিদ বা যোদ্ধাদের বলা হতো ক্ষত্রিয়। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পে আত্মনিয়োগ করতেন এবং সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টনে আনন্দ লাভ করতেন, তাদের বলা হতো বৈশ্য। এসব বৃত্তি ও পেশার জন্যে প্রয়োজনীয় মেধা যাদের ছিলো না, যারা ছিলো সাদাসিধে, যারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে একমাত্র দৈহিক শক্তির ওপর নির্ভর করতো, তাদের বলা হতো শূদ্র। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানকালেও প্রত্যেক জাতি ও সমাজের মধ্যে এই চার শ্রেণীর নরনারীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণদের জন্যে বিশেষ যে চার 'আশ্রমের' কথা বলা হয়েছে সেটা মানুষের জীবনের চারটি বিশেষ অধ্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়। মানবজীবনে এই চার আশ্রমের অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান। মানবজীবনের প্রথম 'আশ্রম' বা স্তর হচ্ছে তার বাল্যকাল। মানুষের জীবনের পরবর্তীকালসমূহে কর্তব্য পালনের পক্ষে প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা লাভের সময় হচ্ছে এটি। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে যৌবনকাল অথবা প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক ও সামাজিক জীবন। বার্ধক্যের শুরুতেই হচ্ছে জীবনের তৃতীয় স্তর। এ সময় মানুষ পারিবারিক উদ্বেগ থেকে প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হয়, উচ্চতর জ্ঞানচর্চার মধ্যেই আনন্দ লাভ করে এবং ইহকালের চেয়ে পরকালের কথাই বেশি করে ভাবে। জীবনের চতুর্থ বা শেষ স্তর হচ্ছে পরিপূর্ণ বার্ধক্য। এ সময় মানুষ দ্বিতীয়বারের মতো শৈশবাবস্থা লাভ করে এবং সংসার থেকে নিজেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। পরবর্তীকালে মানুষের এই স্বাভাবিক শ্রেণী বিভাগ 'গুণ' ও 'কর্মের' ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বংশানুক্রমের ওপর ভিত্তি করে পরিণত হয়েছে কঠোর জাতিভেদ প্রথায়। বর্তমানে কোনো 'বিশ্বামিত্র' তার নিজ গুণের বলে ব্রাহ্মণের মর্যাদা অর্জন করতে পারে না এবং কোনো 'শূদ্রের' ছেলে ঋগ্বেদের ঋষির মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। বর্তমান ভারতে আমরা যা দেখি, তা 'বর্ণাশ্রম' নয় বরং এ হচ্ছে 'বর্ণশংকর'—যা প্রাচীন ভারতের 'বর্ণাশ্রমের' বিকৃত রূপান্ড়র। 'বর্ণাশ্রমের' মূলবাণী যদি পুনরুদ্ধার করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতেই কেবলমাত্র তার

মর্যাদা নির্ধারিত হবে; কোন্ বংশে তার জন্ম বা অন্যান্য অনুরূপ বিষয়সমূহ যার ওপর মানুষের কোনো হাত নেই তার ওপর ভিত্তি করে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে না। সম্ভবত আধুনিক সমাজের এ ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত হতে পেরেই আধুনিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সন্ধান করছেন যাতে করে প্রতিটি ছেলেমেয়েকে তাদের প্রকৃতির অনুকূল শিক্ষা দেয়ার জন্যে তাদের প্রত্যেকের স্বাভাবিক রুচি ও প্রবণতা নিরূপণ করা যায়।

কলেমার শিক্ষা

এক অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় শোনা গিয়েছিলো আল- াহ সুববহানাহু ওয়া তা'আলার কঠোর অথচ করুণাপূর্ণ বাণী **'আল- াহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।'** এ বাণী কঠোর কারণ, এটা অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে মানুষে মানুষে সকল রকম কৃত্রিম ভেদাভেদকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলো। আবার এ বাণী করুণাপূর্ণ কারণ, এটা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মধুর সম্পর্কের কথা উচ্চারণ করলো। আর তা হলো আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সঙ্গে মানুষের পিতৃত্বসুলভ প্রভুত্বের* এবং স্রষ্টার সৃষ্ট জীব হিসাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের। যেসব বাধা ভাইকে ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেসব বাধাকে কলেমা কার্যকরভাবে অপসারণ করে। যার ফলস্বরূপ কলেমা এমন এক সমাজব্যবস্থার পথ উন্মোচন করলো, যাতে করে মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব পরিণত হতে পারে একটি জীবন্ড় বাস্ড়বতায়।

বিশ্ব মানবের একত্বে বিশ্বাস করতে না পারলে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্বে বিশ্বাস অর্থহীন। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে—**'আর সকল মানুষ একই জাতিভুক্ত ছিলো, পরে তারা পৃথক হয়েছে' (১০:১৯)**। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি মানুষকে এক জাতিরূপে সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ সৃষ্টি করার কোনো অধিকারই মানুষের নেই। মানুষের মাঝে যে সাম্যের কথা কলেমা প্রচার করে সেটা গাণিতিক নয় বরং তা সামাজিক। সর্বক্ষেত্রে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সমান হতে পারে না। কেউ কালো, কেউ সাদা, কেউ লম্বা, কেউ খাটো, কেউ পরিশ্রমী, কেউ অলস, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা আবার কেউ ভদ্র, কেউ অভদ্র। অতি স্বাভাবিকভাবেই কেউ কেউ নিজেদের ব্যক্তিগত গুণের দ্বারা অন্যান্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। কিন্ড়ু কলেমার শিক্ষা অনুসারে এই শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের সামাজিক সাম্যের ওপর আঘাত করতে পারে না কিংবা কোনোভাবে এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে না। যদিও ইসলামে সামাজিক আভিজাত্যকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় না, তথাপি কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তি বুদ্ধির ক্ষেত্রে; কোনো সম্পদশালী ব্যক্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভিজাত বলে গণ্য হতে পারেন। একইভাবে একজন হারকিউলিস, রুস্ড়ম বা

* পিতা যেমন তার সন্তানকে গভীর নিরাপত্তায় লালনপালন করেন আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও মানুষকে তার চেয়ে গভীরতম নিরাপত্তায় লালনপালন করেন।

ভীম দৈহিক শক্তিতে আভিজাত্য অর্জন করতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামে সামাজিক আভিজাত্য বলে কিছু নেই।

আল- াহ এক এবং তিনিই বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টা। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্বে বিশ্বাস বিশ্ব প্রকৃতি ও বিশ্বমানবের একত্ব ও অখ ত্বে বিশ্বাস এনে দেয়। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্বে বিশ্বাস সবসময়ই মানুষকে সেই প্রাকৃতিক নিয়মের সংকেত দেয়, যা সকল বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের সন্ধান করে ও ঐক্যের সৃষ্টি করে। বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস না করে কলেমায় বিশ্বাস করা প্রকৃতপক্ষে কলেমাকে অস্বীকার করারই সামিল। কলেমায় নির্দেশিত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মর্যাদা নিরূপিত হয় তার ব্যক্তিগত স্বভাব চরিত্র বা আচার আচরণ দ্বারা অর্থাৎ তার 'গুণ' ও 'কর্মের' দ্বারা; তার বংশগৌরব, ধনসম্পত্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতা বা জীবিকার দ্বারা নয়। কলেমা নির্ধারিত সমাজব্যবস্থায় নারীরা শুধু সামাজিক মর্যাদাই লাভ করেন না বরং তারা পুর ষের সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করেন। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্বে বিশ্বাস মানুষের সকল মিথ্যা ও কৃত্রিম সম্মানবোধকে সরাসরি অস্বীকার করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের খলিফাগণ তৎকালীন যুগের মানুষের মনে ভীতি ও প্রশংসার উদ্রেক করেছিলেন শুধুমাত্র তাদের চারিত্র্যমাধুর্য দিয়ে—রাজ দরবারের মনোমুগ্ধকর শোভা বা জাঁকজমক দিয়ে নয়। সে যুগে কলেমার এই মানবীয় দিক অর্থাৎ মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বকে এমন কঠোর যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলা হতো যে, মহানবী হজরত মুহম্মদ (সা.) তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবারের কোনো সদস্যের প্রতি তাঁর অনুসারীদের দ্বারা কোনো বিশেষ সামাজিক মর্যাদা দানের প্রবণতাকে একেবারেই সহ্য করতেন না।

শ্রেণিহীন সমাজ

আরবদের সামাজিক জীবনে কলেমা বৈপ- বিক পরিবর্তন এনেছিলো। এর ফলে তাদের সমাজে শুধুমাত্র মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিভেদেরই অবসান ঘটলো না বরং তারা তাদের সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠে পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষের মূলোৎপাটন করে একে অন্যকে সহচরের মতো নয়, নিজের আপন ভাইয়ের মতো ভালোবাসতে শিখলো। কলেমার শিক্ষার ফলে মদিনার আনসারগণ মক্কা থেকে আগত মোহাজিরদের সঙ্গে নিজ ধনসম্পদ এমনভাবে ভাগ করে নিলো, যেভাবে আপন ভাইয়েরা তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কলেমার বিশ্বাস প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের এই শিক্ষা দিলো যে, ভ্রাতৃত্বের বাস্তব ও সক্রিয় ধারণা এবং এর বিপরীত ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব ও অহংকার, এ দু'য়ের উৎসই হচ্ছে মানুষের মন, বাহ্যিক জড় পরিবেশ নয়। শ্রেণিহীন সমাজ বলতে তারা বুঝতেন এমন এক সমাজব্যবস্থা যার মধ্যে কোনো শ্রেণিসংঘাত নেই। এই অর্থে আরবের তখনকার মুসলিম সমাজ ছিলো প্রকৃত অর্থেই শ্রেণিহীন সমাজ।

এই শ্রেণিহীন সমাজ শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নি, সৃষ্টি হয়েছিলো আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পিতৃত্বসুলভ প্রভুত্ব এবং মানুষের ভ্রাতৃত্বের প্রতি সক্রিয় বিশ্বাসের ফলে। সে সমাজে বহু দল ও শ্রেণী ছিলো—যেমন কর্মজীবী, ব্যবসায়ী, গোত্রীয় এবং আরো অনেক শ্রেণী। কিন্তু কলেমা শুধু সেসব শ্রেণী ও দলকেই স্বীকার করেছিলো, যেগুলো ছিলো সমাজজীবনে সুষম সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয়। এভাবেই কলেমা সমস্ত রকমের শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী চেতনাকে সক্রিয়ভাবে দূর করেছিলো। কলেমায় স্বীকৃত শ্রেণী ও দলগুলো ছিল একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ এবং এগুলো সমগ্র দেহের উন্নতির জন্য একযোগে কাজ করে যেতো। মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ সমস্ত শ্রেণী ও গোষ্ঠীর কোনো প্রভাবই ছিলো না। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে—**'হে মানবগণ, নিশ্চয়ই এক পুর ষ ও এক নারী থেকে আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের পরস্পরকে চেনার জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন দল ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। নিশ্চয় আল- াহ'র কাছে সে-ই সর্বাধিক ভালো বা সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার' (৪৯ : ১৩)।**

ব্যক্তি ও শ্রেণীর নামকরণ হচ্ছে পরিচয়ের সুবিধার জন্যে, সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণের জন্যে নয়। তৎকালীন মুসলিম সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব খলিফাগণও কোনো বিশেষ সামাজিক মর্যাদা উপভোগ করতেন না। রাজা-মহারাজা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বর্তমানে যেভাবে আড়ম্বরপূর্ণ উপাধিযোগে সম্বোধন করা হয়, তাঁদের সেভাবে সম্বোধন করা হতো না। একজন সাধারণ বেদুইনও তাঁদেরকে তেমনই নাম ধরে সম্বোধন করতো যেভাবে সে তার অন্যান্য সাথিদের সম্বোধন করে। খলিফা ও একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে শুধু এটুকুই পার্থক্য ছিলো যে, একজন খলিফা পদাধিকার বলে বিশেষ বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অধিকার লাভ করতেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন ততোক্ষণ পর্যন্ত তিনি থাকতেন সামাজিক সম্মানের অধিকারী। এই ভ্রাতৃত্ববোধ এতো বাস্তব, এতো অনুপম এবং এতো জীবন্ত ছিলো যে, সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদেরও কোনো প্রত্যাশা ছিলো না কিংবা এ পদের সম্মান ও মহিমা সম্বন্ধে তাঁদের কোনো কৃত্রিম বোধও ছিলো না। ইরানের গর্বিত রাজা হরমুজানকে যখন বন্দি অবস্থায় খলিফা উমরের (রা.) সামনে উপস্থিত করা হয়েছিলো তখন বিজয়ী খলিফা অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতো হাতে মাথা রেখে রাসুলুল- াহ (সা.) এর মসজিদের খোলা সিঁড়িতে নিশ্চিন্ত মনে আরামে ঘুমোচ্ছিলেন। এটাই ছিলো কলেমার শিক্ষা বা অলৌকিকত্ব।

যে রাষ্ট্রে বা সমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এই আদর্শের উপস্থিতি দৃশ্যমান হয় না, সে রাষ্ট্র বা সমাজকে কিছুতেই মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্র বলা যায় না। পশ্চিমা গণতন্ত্র, যাকে নিয়ে অতিমাত্রায় গর্ব করা হয়, সেই গণতন্ত্রে বিঘোষিত সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতাকে মদিনার তৎকালীন মুসলিম সমাজের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে নিকৃষ্টের সঙ্গে মহামহিমের কিংবা শঠতার সঙ্গে সত্যের তুলনা করার মতোই হাস্যকর বলে মনে হবে। রাসুলুল- াহ (সা.) এর এক নিকট আত্মীয়া সম্মানিত কোরেইশ বংশীয় মেয়ে জয়নবের

বিয়ে হয়েছিলো যায়েদ নামক এক ক্রীতদাসের সঙ্গে। এর ফলে বহুকালের প্রচলিত বংশগৌরব ও বংশমর্যাদার অহমিকার ভিত সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। বিখ্যাত নিগ্রো ক্রীতদাস বেলাল (রা.) নিজের ব্যক্তিগত চারিত্র্যমাধুর্য বলে এবং খোদাভীতিতে এমন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন যা পৃথিবীর যেকোনো মানুষেরই কাম্য। আধুনিক বিশ্বের তথাকথিত বিবেকবান ও জ্ঞানী শ্বেতাঙ্গ অভিভাবেকরা একজন স্বাধীন নিগ্রোর সঙ্গে একই গির্জায় বসে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতে পর্যন্ড় রাজি হন না—যদিও সাদা, কালো, পিত নির্বিশেষে সকল মানুষের একক স্রষ্টা হচ্ছেন আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

শ্রেণিসংগ্রাম

কলেমার ভ্রাতৃত্ব সর্বজনীন এবং তা কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শূন্যতাবাদীরা কথায় কথায় মানুষের সাম্যের কথা বলে। কিন্ড়ু যে জীবনদর্শন মানুষের দৈহিক তাৎক্ষণিক বস্ড়ুগত প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি নিয়েই ব্যস্ড়, তার পক্ষে মানুষের মধ্যে সাম্যকে বাস্ড়বায়িত করা সম্ভবপর নয়। যে জীবনব্যবস্থা মানুষকে পরস্পরের প্রতি নিদার"ণ শত্র"ভাবাপন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে এবং যে জীবনদর্শন শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে একটি বিশেষ শ্রেণীর দ্বারা আর সব শ্রেণীকে ধ্বংস করে দিয়ে শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের ভান করে, সে জীবনদর্শনের ভিত্তি যে ঈর্ষা ও ঘৃণা; ভালোবাসা নয়, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। এ জাতীয় জীবনদর্শন প্রেমের নয় বরং ঘৃণার। এ জাতীয় জীবনদর্শন মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে দিয়ে তার মধ্যে যে পশু প্রবৃত্তিগুলো আছে তাকেই লালন করে। 'জোর যার মুলুক তার' বলে একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে। প্রাচীনকালে 'জোর' বলতে দৈহিক ক্ষমতা বা শক্তিকে বুঝাতো। সে সময়ে দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি ও শ্রেণীর লোকেরাই ছিলেন শাসকশ্রেণী। তারা দুর্বলদের শোষণ করতেন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রবলের দ্বারা দুর্বলের শোষিত হওয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে আর শুর" হয় প্রবল ও দুর্বলের মধ্যে শ্রেণিসংগ্রাম। দৈহিক দিক দিয়ে দুর্বলেরাই ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই পরিশেষে তারাই জয়ী হলো। এরপর শোষণের হাতিয়ার হিসেবে দৈহিক শক্তির আর কোনো গুর"ত্বই রইলো না। এরপর আর বাহুর শক্তি দ্বারা সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হতো না, এই অর্থে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্ড়ু এই শ্রেণিসংগ্রামের ফলে আরো একটি শ্রেণীর উদ্ভব হলো। এ নতুন শ্রেণী হলো বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গঠিত। তখনো 'জোর যার মুলুক তার' নীতিই ঠিক থাকলো—পার্থক্য হলো শুধু এটুকু যে, জোর বলতে আর দৈহিক শক্তি বুঝাতো না বরং বুঝাতো বুদ্ধির জোর। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদের মতো এসব বুদ্ধিজীবীরাই সমাজে ভোগ করতেন সর্বাধিক মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা। এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী শেষ পর্যন্ড় শোষক শ্রেণীতে পরিণত হলো এবং আবার শুর" হলো শ্রেণিসংগ্রাম। এ সংগ্রামে বুদ্ধিজীবীরা অবশেষে পরাজিত হলেন এবং এর ফলে আবার প্রতিষ্ঠিত হলো শ্রেণিহীন সমাজ। কিন্ড়ু তবু শোষণ বন্ধ হলো না। নতুন নতুন শ্রেণীর উত্থানপতন ঘটলো ঠিকই কিন্ড়ু শোষণ

পূর্বের মতোই চলতে থাকলো। প্রত্যেক সংগ্রামের পরই 'জোর' নতুন অর্থ ধারণ করলো। ক্ষমতার লড়াইয়ে বুদ্ধিজীবীদের পতনের পর পুঁজিবাদী শ্রেণী শাসক ও শোষক শ্রেণীতে পরিণত হলো এবং বর্তমান বিশ্বে এরাই উপভোগ করছে সর্বাধিক সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা। তাই সারা বিশ্বে এখন চলছে এক অর্থনৈতিক শ্রেণিসংগ্রাম। এখন একজন হারকিউলিস, ভীম বা র"স্ড়মকে কেউ কোনো মূল্য দেয় না। একইভাবে একজন পিথাগোরাস, নিউটন বা এডিসনের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীকে শোষণ করার জন্যে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তৈরির ব্যাপারে তাদের সমস্ড় প্রতিভা ধার দেয়া। পূর্ববর্তী অন্যান্য শ্রেণিসংগ্রামের মতো এই অর্থনৈতিক শ্রেণিসংগ্রামেও দরিদ্র জনসাধারণ জয়লাভ করেছে এবং বিশ্বের এক বিরাট ভূখ" তাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব স্থানে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবে তা কেবল এই অর্থে শ্রেণিহীন যে, আর্থিক সম্পদের ওপর ব্যক্তির অধিকারকে 'জোর' বা শোষণের হাতিয়ার বলে বিবেচনা করা হয় না। এভাবেই অবিরত শ্রেণিসংগ্রাম চলতে থাকবে এবং প্রতিবারই শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তবে শোষণ কখনো বন্ধ হবে না বরং পুরাতনের স্থলে নতুন নতুন শ্রেণী গড়ে উঠবে। 'জোর' কথাটির সংজ্ঞা ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকবে এবং যে পর্যন্ড় না মানুষের শোষণ প্রবৃত্তির মূলোৎপাটন করা সম্ভব হবে, সে পর্যন্ড় 'জোর যার মুলুক তার'ই থাকবে।

ব্রাহ্মণ বা ধার্মিক এবং বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধির বলে, ক্ষত্রিয় বা শারীরিক শক্তির অধিকারীরা তাদের তরবারির জোরে, বৈশ্য বা পুঁজিপতিরা তাদের সম্পদের জোরে, আর এখন শূদ্র বা দরিদ্র জনগণ নিজেদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে অন্য সবাইকে উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠিত করছে নিজেদের একনায়কতন্ত্র।

যদি দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিশ্বের বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন তবে ব্রাহ্মণদের একনায়কতন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। এভাবে ক্ষমতা চক্রকারে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে ঘুরতে থাকবে। কিন্ড়ু যতোদিন পর্যন্ড় অন্যকে শোষণ করার প্রবৃত্তি মানুষের মনে জীবন্ড় থাকবে ততোদিন পর্যন্ড় অবস্থার পরিবর্তন হবে না। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর রচিত 'রোড টু ফ্রিডম' গ্রন্থে অত্যন্ড় সঠিকভাবে বলেছেন যে—'শূন্যতাবাদী জড়বাদের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার কার্ল মার্ক্স বিশ্বাস করতেন যে, দরিদ্র জনগণের একনায়কতন্ত্র অবশ্যম্ভাবী। কিন্ড়ু তিনি একথা কোথাও বলেন নি যে তা মানবতার জন্যে কল্যাণকর।' শোষণ প্রবৃত্তি মানুষের নিজ অন্ড়র থেকে উৎসারিত হয় আর শ্রেণিসংগ্রাম মানুষের অন্ড়রে লুক্কায়িত অহমিকা ও পরার্থপরতার অন্ড়র্দ্বন্দ্বের বাহ্য অভিব্যক্তি। ব্যক্তিদেহে যেমন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান থাকে সমাজদেহেও ঠিক তেমনই বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠী বিদ্যমান থাকবে। দেহের বস্ড়ুগত প্রয়োজনগুলোর সমাধান করা হলে মানুষের শান্ড়িপূর্ণ জীবনের পক্ষে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব। কিন্ড়ু শুধু দেহের বস্ড়ুগত সমস্যার সমাধান করলেই শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে না।

এর জন্যে প্রয়োজন শ্রেণী অহমিকা ও শ্রেণী চেতনাকে সমূলে উচ্ছেদ করা। এটা অর্জন করা যেতে পারে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পিতৃত্বসুলভ প্রভুত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্বের ওপর সক্রিয় বিশ্বাসের মাধ্যমে মানবীয় চরিত্রের মহত্তর গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে এবং পরিশেষে অহমিকা ও পরার্থপরতার মধ্যে শান্ড়ি ও ঐক্য স্থাপন করে। সমাজ দেহের এক বা একাধিক অঙ্গ বিনষ্ট করে নয় বরং সাধারণের মঙ্গলের জন্যে সেগুলোর সম্মিলিত লালন ও বিকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব সত্যিকারের শ্রেণিহীন সমাজ।

ক্ষুধা ও যৌনতা

বৈজ্ঞানিক নাস্ড়িকতার দর্শন জড়বাদের মতে ক্ষুধা ও যৌনতা এ দুটোই হলো মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি, আর এ দুটোর মধ্যে ক্ষুধার গুর"ত্বই বেশি প্রাধান্য পায়। যেহেতু কোনো সমাজব্যবস্থাই মানুষের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের সহায়ক হতে পারে না, যদি না সে ব্যবস্থা মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তিগুলোকে স্বীকার করে এবং গুর"ত্ব অনুসারে তাদের পরিতৃপ্তির সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে। এজন্যে দরকার মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তিগুলোকে অতি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করা এবং মানুষের জীবনগঠনে তাদের প্রত্যেকের গুর"ত্ব অনুসারে তাদের শ্রেণিবদ্ধ করা। একত্বের অমীয় বাণী কলেমা সর্বদা ঐক্যের সন্ধান করে এবং সকল বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের সন্ধান লাভ করে। যৌনপ্রবৃত্তি, ক্ষুধা, আত্মসংরক্ষণ, ক্ষমতালিপ্সা প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে দেখা যায়। কিন্ড়ু এই প্রবৃত্তিগুলোর সবগুলো সব মানুষের মাঝে সমানভাবে সক্রিয় থাকে না। কারো মাঝে ক্ষুধা, কারো মাঝে ক্ষমতা-লিপ্সা আর কারো মাঝে যৌন-প্রবৃত্তি প্রবল থাকে। তাই এক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যের কোনো অভাব নেই।

আত্মসংরক্ষণ প্রবৃত্তির মতো ক্ষুধাও নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী প্রবৃত্তি, কিন্ড়ু তা সত্ত্বেও একে মৌলিক প্রবৃত্তি বলা যায় না। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, যৌন ক্রিয়ার দ্বারা প্রজননের মাধ্যমে নিজ বংশধারা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের প্রবৃত্তিই হচ্ছে মৌলিক ও কেন্দ্রীয় প্রবৃত্তি এবং এটিকে কেন্দ্র করেই জীবনের বাকি সব প্রবৃত্তিগুলো আবর্তিত হয়। মানুষ খাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকে না বরং বাঁচার জন্যে খায় এবং বেঁচে থাকে নিজের অনুরূপ জীবকে উৎপন্ন ও বৃদ্ধি করার জন্যে। সে জন্যেই ক্ষুধাকে মৌলিক প্রবৃত্তি বলা চলে না বরং ক্ষুধা হচ্ছে সাহায্যকারী প্রবৃত্তি, কেননা ক্ষুধার পরিতৃপ্তি মানুষের সহজাত যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থের সহায়তা করে। তবে একথা সত্য যে, সাহায্যকারী প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে ক্ষুধা সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সহজাত প্রবৃত্তি। নিজের বংশ বৃদ্ধি ও উৎপাদনের জন্যে জীবকে সক্রিয় রাখতে হলে ক্ষুধার পরিতৃপ্তি প্রয়োজন। সুতরাং একথা বলা ঠিক নয় যে, অর্থনৈতিক শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা গেলেই শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান করা যাবে। বরং শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন শোষণ

বন্ধ করা এবং শান্ড়িপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃত শান্ড়িপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলার উচ্চাশা পোষণ করে এমন যেকোনো সমাজবিপ- ব অবশ্যই শুর" হবে মানুষের যৌনজীবনে বিপ- বের মাধ্যমে। এরূপ বিপ- বের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় বস্ড়ুগত ধনসম্পদের সুষম ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করা। কিন্ড়ু এরূপ বিপ- ব শুর" হবে বস্ড়ুগত সম্পদ উৎপাদনকারী ও বৃদ্ধিকারীদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ন্যায়সঙ্গত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নয়, বরং মানুষের উৎপাদন ও সংখ্যা বৃদ্ধিকরণের দুই মাধ্যম নারী ও পুর"ষের পারস্পরিক সম্পর্ককে ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রাক-ইসলামি অর্থাৎ অন্ধকার যুগে নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা, অধিকার বা স্বাধীনতা ছিলো না। কিন্ড়ু তারা তাদের দেহকে সুস্থ রেখে যাতে পুর"ষকে যথেষ্ট আনন্দ দিতে পারে সেজন্যে তাদের প্রচুর খাবার দেয়া হতো। কিন্ড়ু শুধুমাত্র খাওয়া-পরা, বাসস্থান ও অনুরূপ বস্ড়ুগত অন্যান্য প্রয়োজন পরিতৃপ্তির দিক দিয়ে পুর"ষ ও নারীর সাম্য মোটেও নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে না, আর যা মানব চরিত্রের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য সেই আত্মসম্মানবোধও জাগ্রত করতে পারে না। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্ব এবং মানবজাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, কলেমার এই শিক্ষা নারী জাতিকে তাদের চিরকালের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে পুর"ষের সমান সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলো। যেটুকু পার্থক্য থাকলো তা শুধু প্রকৃতিগত শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য—যা চিরকালই থাকবে। তাছাড়া নারী ও পুর"ষের মধ্যকার আর সব পার্থক্য ইসলাম বাতিল করে দিলো। ইসলাম প্রকৃতির প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ না করে প্রকৃতিকে নির্ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে এবং এজেন্য সৃষ্টিক্ষেত্রে পুর"ষের সৃজনশীলতা এবং বহু বিবাহপ্রবণ প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়, একই সঙ্গে নারীকে প্রজনন প্রক্রিয়ায় স্বাধীন অংশ গ্রহণকারী হিসেবে মর্যাদা দেয়। ইসলাম তাই বিবাহকে নারী ও পুর"ষের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাকৃত সামাজিক চুক্তিতে পরিণত করেছে। প্রাথমিক যুগে মদিনার মুসলিম সমাজে নারীরা এতোই স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতেন যে, আনুষ্ঠানিক অনুমতি ব্যতীত পুর"ষেরা কেউই তাদের স্ত্রীদের কক্ষেও প্রবেশ করতে পারতেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাজনৈতিক বিপ- ব

জাতি ও জাতীয়তা

সভ্যতার প্রারম্ভে মানুষ লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পরিবারে বিভক্ত ছিলো। প্রত্যেক পরিবারই ছিলো এক একটা জাতি ও রাষ্ট্র। গোষ্ঠীপ্রধান ছিলেন পরিবারের সর্বময় কর্তা এবং পরিবারের কল্যাণই ছিলো পরিবার নামক রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য। পরিবারে পরিবারে দীর্ঘকাল স্থায়ী সংঘর্ষ তথা যুদ্ধ চলতো আবার সন্ধিও স্থাপিত হতো। শতাব্দীর পর শতাব্দী এভাবে চলার পর এই পরিবারগুলো প্রসারিত হয়ে পরিণত হলো গোত্রে। মানুষ তখন এটা অনুভব করলো যে, গোত্র একটা অখ ন্ড সত্তা এবং গোত্রের প্রতিটি মানুষের শিরায় একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। মানুষের বিবর্তনের এই স ড়রে গোত্র পরিণত হলো জাতি ও রাষ্ট্রে এবং গোত্রপতিই হলেন গোত্ররাষ্ট্রের রাজা। একই গোত্রভুক্ত পরিবারের মধ্যকার বিবাদ সে সময়ে বিবেচিত হতো গোত্রের অভ্যন্ড়রীণ বিষয় হিসেবে এবং গোত্রই এসব মিমাংসা করতো। গোত্রভুক্ত পরিবারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা ও গোত্রের মধ্যে শান্ড়ি শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব ছিলো গোত্রপতির। সুতরাং এক গোত্রের সঙ্গে অন্য গোত্রের সম্পর্ককে গোত্ররাষ্ট্রের বৈদেশিক ব্যাপার বলে ধরে নেয়া হতো। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হবার কারণে এবং দ্র ত্তগতিতে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গোত্রগুলোর বিস্তৃতি ঘটলো, দেখা গেলো যে একই এলাকায় বসবাসকারী মানুষের রক্ত ও ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে এবং তাদের একই ধরনের ভূমি ও একইরূপ ভাষার প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে একইরকম সাধারণ আচার-আচারণ, অভ্যাস ও জীবনব্যবস্থা। সাধারণ রক্ত, সাধারণ ভাষা ও সাধারণ অভ্যাস থেকে উৎপন্ন হলো বংশচেতনা। বংশই তখন পরিণত হলো জাতিতে এবং তাদের আবাসভূমিই হলো তাদের স্বদেশ। এভাবে ক্রমে ক্রমে আত্মপ্রকাশ করলো বংশীয় এবং আঞ্চলিক জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ। প্রতিটি অঞ্চল পরিণত হলো এক একটা পৃথক রাষ্ট্রে এবং স্বদেশ প্রেম ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের কল্যাণ সাধনই হয়ে দাঁড়ালো সর্বোচ্চ পুণ্যের কাজ হিসেবে। এভাবে একের পর এক পরিবার, গোত্র ও বংশ গড়ে উঠলো মানবজাতির বিভাজনের এক একটা পৃথক পৃথক ইউনিট হিসেবে। পরিবার রাষ্ট্রে ছিলেন পারিবারিক দেবদেবতা ও আচার্যগণ, গোত্রীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হলেন গোত্রীয় দেবদেবতা ও আচার্যগণ। আবার যখন আঞ্চলিক ও বংশীয় জাতীয়তার জন্ম হলো তখন আঞ্চলিক ও বংশীয় দেবদেবী ও আচার্যদের আবির্ভাব ঘটলো। অসংযত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেমন পারিবারিক শান্ড়ি বিনষ্ট করেছিলো, অনিয়ন্ত্রিত পারিবারিক অহমিকা যেমন গোত্রের শান্ড়ি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেছিলো, গোত্র প্রেম যেমন বংশের ঐক্য বিনষ্ট করেছিলো ঠিক

তেমনিভাবে বর্তমান সময়েও সংকীর্ণ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ বিশ্বে শান্ড়ি নষ্ট করছে এবং এর ফলে মানুষের জীবন অসহনীয় দুঃখ কষ্টে ভরে উঠেছে।

প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো বিশেষ পরিবার, গোত্র, বংশ বা দেশে জন্মগ্রহণ করে এবং বিশেষ ভাষায় কথা বলে। এসব দৈব ঘটনা। এর ওপর মানুষের কোনো হাত নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ গুণকে মানুষ অস্বীকার করতে পারে না এবং মানবীয় প্রচেষ্টায় এসব দৈব ঘটনা পরিবর্তিত হয় না। তাই পারিবারিক, গোত্রীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় ও ভাষাগত সাদৃশ্য ও ঐক্য যদি মানুষকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করার ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয় তবে বিশ্বমানবের একতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব কখনো বাস্ড়বরূপ লাভ করতে পারবে না এবং পৃথিবীতে স্থায়ী সুখশান্ড়ি প্রতিষ্ঠিত হবে না। পরিবার, গোত্র, আঞ্চলিকতা, ভাষা ও স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতির কারণে যে বিভেদ, কলেমা এক আঘাতে তা নস্যাৎ করে দিয়ে হেরা পর্বতের চূড়া থেকে ঘোষণা করেছিলো—**'আল- াহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহম্মদ (সা.) আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাসুল'**। কলেমার ঘোষণা হচ্ছে সারাবিশ্বের জন্যে একজনই উপাস্য (আল- াহ) এবং একজনই রাসুল বা পয়গম্বর। কলেমায় বর্ণিত আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কোনো বিশেষ পরিবার, গোত্র বা জাতির 'রব' (অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা বা বিবর্তনকর্তা) নন বরং তিনি বিশ্ব জগৎসমূহের রব। একইসঙ্গে কলেমায় বর্ণিত রাসুল হজরত মুহম্মদ (সা.)কে সারাবিশ্বের রহমতস্বরূপ বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক ও অদ্বিতীয় এবং বিশ্বমানবও এক ও অখ ন্ড। তাই পবিত্র কুরআনে জাতি ও জাতীয়তাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কয়েকটি মাত্র স্পষ্ট শব্দে বলা হয়েছে—**'সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্ড়র্ভুক্ত' (২: ২১৩)**। আর এটাই কলেমার আদর্শ। তবে এই আদর্শ বাস্ড়বায়নের একটি পদক্ষেপ হিসেবে প্রথম প্রয়োজনই হচ্ছে জীবন সম্পর্কে সমস্ড় মানুষের একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা। কলেমার ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করে না বরং মতবাদের সাদৃশ্যপূর্ণ ধর্মের ঐক্য গড়ে তোলাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে। মতবাদের সাদৃশ্য হচ্ছে ইচ্ছাধীন ব্যাপার এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের জন্য এটা স্থায়ী এবং অলংঘনীয় বাধা নয়। মানুষকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করার ভিত্তি হিসেবে মতবাদের সাদৃশ্যকে স্বীকার করে নিলে সেটা বিশ্ব জাতীয়তার পরিপন্থিতো হবেই না বরং সবদিক থেকে তার সহায়ক হবে। কারণ পৃথিবীতে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার কথা চিন্ড়া করার আগে জীবন সম্বন্ধে মানবজাতির একটা সাধারণ আদর্শ থাকা আবশ্যক।

পবিত্র কুরআন মানুষকে সেই আসন্ন সাধারণ জীবনাদর্শের সন্ধান দিয়ে ঘোষণা করেছে—**'বিশ্ববাসীতো পরস্পর ভাই-ভাই' (৪৯:১০)**। পবিত্র কুরআনের এই ঘোষণা গৌণ অর্থে সারাবিশ্বের মুসলমানকে একই জাতির অন্ড়র্ভুক্ত করেছে, কিন্ড়ু তারা বংশ বা বর্ণগত অর্থে এক জাতি নয়। চৌদ্দশ' বছর আগে বেদুইনদের নিকট কলেমার এই মহাবাণী পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর পারিবারিক ও গোত্রীয় দ্বন্দ্বে লিপ্ত আরববাসীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটলো। ঝগড়া-বিবাদ ত্যাগ করে তারা

নিজেদের স্মৃতি থেকে দীর্ঘদিনের লালিত প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার মূলোচ্ছেদ করে মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে এক অতি উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছিলো, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি কিছু আছে? মহানপ্রাণ এই আরবরাই কলেমার অমিয় বাণীকে দূর দূরান্তে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন শান্তির দূত হিসেবে বিশ্বে সুখশান্তি বিধানের মহান ব্রত নিয়ে, বিজয়ীর মনোভাব নিয়ে নয় বরং উৎসর্গীকৃত প্রাণ বিনয়ী ধর্মপ্রচারকের মতো প্রচার করেছিলেন বিশ্বজনীন জাতীয়তা।

সার্বভৌমত্ব

পে- টো বলেছেন—'যে পর্যন্ত না দার্শনিকেরা রাজক্ষমতা লাভ করবেন অথবা রাজা-বাদশাহরা দর্শনের গুণ ও শক্তিতে অনুপ্রাণিত হবেন এবং জ্ঞান ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব -এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের সম্মিলন একই ব্যক্তির মধ্যে না ঘটবে, সে পর্যন্ত মানবজাতির দুঃখকষ্ট দূরীভূত হবে না'। কেননা রাজনীতিবিদরাই সর্বাবস্থায় মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাদের এই গুরুদায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার ওপরই নির্ভর করে মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মতে প্রতিটি অমঙ্গল এমনকি একটি শিশুর অকালমৃত্যু পর্যন্ত রাজাদের পাপ এবং অযোগ্যতার ফল। এটা সুস্পষ্ট ও সর্বজনস্বীকৃত মতবাদ যে, ব্যক্তিদেহের মতো সমাজদেহও জীবন্ত এবং এর জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় কঠোর ও সুদৃঢ় প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উদ্ভিদের জীবন, জীবজন্তুর জীবন, ব্যক্তিজীবন এবং মানুষের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় জীববিজ্ঞানের নিয়মকানুন দ্বারা। বিজ্ঞানের যে শাখা বিশেষভাবে মানবদেহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাকে যেমন মানব জীববিজ্ঞান বলা হয় ঠিক তেমনই বিজ্ঞানের যে শাখা সমাজসংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে তাকে সমাজ জীববিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞান বলে। ব্যক্তিদেহের পক্ষে চিকিৎসক যেমন সমাজদেহের পক্ষে সমাজবিজ্ঞানীরাও তেমন। সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের গুণ বিচারে যেহেতু সমাজের মর্যাদা নির্ধারিত হয় সে জন্যে একজন রাজনীতিবিদের দৃষ্টি হতে হবে একইসঙ্গে চিকিৎসক ও সমাজবিজ্ঞানীর। অর্থাৎ একজন রাজনীতিবিদের ব্যক্তিদেহ ও সমাজদেহ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো জীববিজ্ঞানও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বরং অন্যান্য সব বিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত–অর্থাৎ এটা একটা অখণ্ড ও ব্যাপক জিনিসের খণ্ডিত অংশ। জীববিজ্ঞান ও এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তৃতি সমগ্র সৃষ্টির জন্ম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় নিয়ন্ত্রণকারী সর্বজনীন নিয়ম শৃঙ্খলা তথা সর্বজনীন জীববিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই সারা বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে সুসংহত জ্ঞান লাভ করতে পারলে তার দ্বারাই মানুষ নিজের প্রকৃতি ও নিয়তি সম্পর্কেও চরম-জ্ঞান লাভ করতে পারে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, জীববিজ্ঞানেও যার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেই স্পেনসার যখন বলেন—'অসমন্বিত তথা অগোছালো জ্ঞান হচ্ছে নিম্নশ্রেণীর জ্ঞান, বিজ্ঞান অংশত সমন্বিত

জ্ঞান কিন্তু সবচেয়ে সমন্বিত জ্ঞান হচ্ছে দর্শন' তখন বুঝা যায় যে তিনি পূর্বে উল্লেখিত প্লেটোর সুবিখ্যাত রাজনৈতিক উক্তির ব্যাখ্যা দান করছেন।

সুতরাং রাজনীতি হচ্ছে মানুষের বিজ্ঞান ও মানবিক জীবনদর্শন। এটা ক্ষমতা দখল আর লোক ঠকানোর কৌশলমাত্র নয়। বর্তমানকালে মানবজাতির সব দুঃখদুর্দশার মূলে রয়েছে অনৈতিক ও হতবুদ্ধি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অক্ষম ও অসৎ লোকেরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভ করে। এ ব্যবস্থার মাহাত্ম্য এই যে, শুধুমাত্র মাথা গুনতির মাধ্যমে সব কাজের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সাধারণত ঊনপঞ্চাশ শতাংশ যোগ্য লোকের মতামতকে উপেক্ষা করে একান্ন শতাংশ অযোগ্য লোকের মতামতকে অভ্রান্ত বলে ধরে নেয়া হয়। আর এরই নাম গণতন্ত্র। কেউ গ্রাহ্য করুক বা না-ই করুক এটা কঠিন সত্য যে, রাজনৈতিক বা অন্য যে কোনোরকম সার্বভৌমত্ব কোনো ব্যক্তির, রাজা-বাদশাহের, স্বেচ্ছাচারী শাসকের কিংবা মানুষের কোনো সংঘের এখতিয়ারভুক্ত নয়—এ সার্বভৌমত্ব বিশ্বের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকারী আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান সমৃদ্ধ প্রকৃতির সমন্বিত নিয়মের ওপর ন্যস্ত। যেসব সৎ ও দক্ষ লোকের এ জ্ঞান আছে কেবল তারাই রাজনীতি করার যোগ্য। কেননা কেবলমাত্র তারাই প্রকৃতির নিয়ম ও আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছা অনুসারে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত। কেউ প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে, তবে তা অল্পক্ষণের জন্যে? কেননা সব সময়ের জন্যে প্রকৃতিকে অবহেলা করা যায় না। তাই হোরেস বলেছিলেন—'তোমরা গুলতির সাহায্যে প্রকৃতিকে দূরে ছুঁড়ে দিতে পারো কিন্তু সে বারবার ফিরে আসতেই থাকবে।'

'আল- াহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই'—কলেমার এই ঘোষণা সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে এবং এটা ন্যস্ত হয় আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ওপর। সুতরাং মানবপ্রণীত কোনো আইন বা প্রথা সংযত না অসংযত, যৌক্তিক না অযৌক্তিক, কার্যকর না অকার্যকর তা মাথা গুনতি করে নির্ধারণ করা চলবে না। বরং তা নির্ধারণ করতে হবে অতিলৌকিক প্রকৃতিলব্ধ জ্ঞান ও অন্যান্য মানবীয় প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা এবং একইসঙ্গে তা প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে ব্যক্ত আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি বা অসঙ্গতিপূর্ণ কিনা সেটির মাধ্যমে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, কলেমায় ঘোষিত সত্যিকারের স্বাধীনতার সন্ধান সরকারের কাঠামো বা শাসনকর্তাদের প্রকারের ওপর নির্ভর করে না; বরং তা নির্ভর করে প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব প্রতিভাকে চরমভাবে বিকশিত করার অধিকার ও সুযোগ লাভের ওপর। অন্যকথায় বলা যায়, সত্যিকারের স্বাধীনতা রয়েছে সেই সমাজব্যবস্থায়, যে সমাজব্যবস্থায় নিজের 'ফিতরাত' অর্থাৎ 'প্রকৃতি' অনুসারে নিজের ব্যক্তি প্রতিভাকে উন্নত ও বিকশিত করার পর্যাপ্ত সুযোগ ও অধিকার রয়েছে। সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইসলাম যে ধারণা পোষণ করে তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা.) এর অভিষেককালীন সময়ে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে। তিনি বলেছিলেন—'যে পর্যন্ত আমি

আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও রাসুল (সা.)কে মেনে চলি সে পর্যন্ড়ই আমার অধিকার আছে আপনাদের আনুগত্য দাবি করার। যখন আমি সঠিক পথে চলবো, আপনারা তখন আমার অনুসরণ করবেন। আমি যখন ভুল করবো, আপনারা আমাকে সংশোধন করবেন'। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং গণতন্ত্রের এই মহান মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়েই একজন সাধারণ বেদুইন নারী সেকালের খলিফা উমর (রা.) এর অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে কুণ্ঠিত হন নি, যখন খলিফা উমর (রা.) বিবাহ চুক্তিতে নারীদের অধিকার কিছুটা খর্ব করার চেষ্টা করেছিলেন। অথচ খলিফা উমর (রা.) এর নাম সে সময়ে বিশ্বের শক্তিধর সকল রাজা-বাদশাহের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করতো।

পৃথিবীতে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী। কিন্ড়ু তার সৃজনশীল প্রতিভা শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। তাছাড়া আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছায় প্রকৃতির যেসব নিয়মকানুন বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করে সেসব নিয়মকানুন তৈরি করা, পরিবর্তন করা বা সংশোধন করার ক্ষমতাও মানুষের নেই। প্রাকৃতিক নিয়মকানুনকে জানার এবং সেই জানা জ্ঞানের সাহায্যে বিদ্যমান ও প্রাপ্ত পদার্থ ও উপাদান থেকে নতুন নতুন আকার বা আকৃতি সৃষ্টি করার ক্ষমতার মধ্যেই তার সৃজনশীলতা সীমাবদ্ধ। রূপান্ড়রের কতকগুলো কঠোর প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা জীবন ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত হয়। যেহেতু প্রকৃতিকে জানা যায়, তাই যদি প্রকৃতির নিয়মকানুন সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেয়া যায় এবং এর সঠিক প্রয়োগ করা যায় তাহলে আমরাও জীবন ও মৃত্যু দুই-ই ঘটাতে পারি। প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ প্রয়োগ দ্বারা মানুষ স্বাভাবিকভাবে নানারকম সুফল পেতে পারে, কিন্ড়ু প্রাকৃতিক নিয়মের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না; জীবন ও মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করে সে জীবন ও মৃত্যু ঘটাতে পারে, কিন্ড়ু সূর্যকে পশ্চিমদিকে উদিত হতে এবং পূর্বদিকে অস্ড় যেতে বাধ্য করতে পারে না। সমালোচকদের সঙ্গে হজরত ইব্রাহিম (আ.) এর বিতর্কের বর্ণনায় পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে— **"তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নাই, যে ইব্রাহিমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো, যেহেতু আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহিম বললেন: 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বললো: 'আমিওতো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই'। ইব্রাহিম বললেন: 'আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূর্যকে পূর্বদিক হতে উদয় করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করাও তো'। অতঃপর যে কুফুরি করেছিলো সে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো" (২ : ২৫৮)।**

মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার প্রাথমিক প্রকাশ ঘটে তার ধ্যানধারণার মাধ্যমে এবং তার ধ্যানধারণাই ক্রমান্বয়ে তার মধ্যে জাগিয়ে তোলে সৃষ্টি করার বাসনা, কল্পনা ও ইচ্ছা। মানুষের এই সৃজনশীল প্রতিভার সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার উভয়ই হতে পারে। ধারণা বা মতবাদই বিশ্বকে আলোড়িত করে এবং মানুষের রীতিনীতিকে প্রভাবিত করে। বিশ্বের যেসব চূড়ান্ড় যুদ্ধ মানুষের জীবনে বিপ- ব সাধন করে বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার উত্থান ও পতন ঘটিয়েছিলো, তাদের প্রতিটিই ছিলো একটা মতবাদ বা বিশ্বাসের যুদ্ধ; এসব আদর্শের তথা মতবাদের যুদ্ধ দৃষ্টির অন্ড়রালে সংঘটিত হয় এবং জয়ী হয়। আমরা প্রকাশ্য যেসব যুদ্ধ দেখি সেগুলো এসব অদৃশ্য যুদ্ধের ফলমাত্র। উদাহরণস্বরূপ নাস্ড়িকতাবাদী জড়বাদের দু'টি শক্তি পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে মতবাদগত অদৃশ্য যুদ্ধের উলে- খ করা যেতে পারে। সমাজতন্ত্রী ভাবধারা সমাজের পুঁজিবাদী মানুষের মস্ড়িষ্ক ও হৃদয়ের উপর আঘাত করে এবং এই অদৃশ্য যুদ্ধে রাশিয়ার পুঁজিবাদ পরাজিত হয়। দুই শক্তির মধ্যে পরিশেষে সংঘটিত প্রকাশ্য সশস্ত্র যুদ্ধে সমাজতন্ত্রের যে বিজয় সুচিত হয় তা মতবাদের বা আদর্শের অদৃশ্য যুদ্ধেরই ফল।

মানুষের মনে ধারণার সৃষ্টি হয় দু'টি উৎস থেকে। একটি হচ্ছে স্বজ্ঞার মাধ্যমে অর্জিত অতিলৌকিক প্রকৃতিলব্ধ জ্ঞান আর অন্যটি হচ্ছে স্বজ্ঞা থেকে বুদ্ধি যখন বিচ্ছিন্ন থাকে সে অবস্থায় বহিঃইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত আশু বস্ড়ুগত পরিবেশের অন্ড়র্মুখী জ্ঞান। প্রথম উৎস থেকে প্রাপ্ত ধারণাসমূহ সৃজনশীল প্রতিভার সদ্ব্যবহার করে অপরদিকে আশু বস্ড়ুগত পরিবেশ থেকে সৃষ্ট ধারণাগুলো মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার অপব্যবহার করে; এখানেই মানুষের জীবনে দর্শনের গুর"ত্ব। মানুষ নতুন নতুন আকার, আকৃতি, নমুনা ও প্রজাতি সৃষ্টি করতে পারে কিন্ড়ু সেই সৃষ্টি তার স্রষ্টার জন্যে কল্যাণকর না অকল্যাণকর তা নির্ভর করে সৃজনী ধারণার ওপর। যথার্থ জ্ঞান ও পা"ত্য থেকে যে ধারণার সৃষ্টি সেটা কল্যাণকর ও স্বাভাবিক কিন্ড়ু আশু বস্ড়ুগত পরিবেশ থেকে উৎপন্ন অন্ড়র্মুখী ধারণা, তা আপাতদৃষ্টিতে যতই আকর্ষণীয় মনে হোক না কেন, পরিশেষে তা ক্ষতিকর। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানের সব সুন্দর সুন্দর মোরগ-মুরগি উৎপাদন করা হয়েছে ভারতীয় জংলি মোরগ-মুরগিকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় খাওয়ানো, প্রজনন এবং জাত উন্নয়নের মাধ্যমে। ইংল্যান্ডের অরপিংটন মোরগ-মুরগিকে এতোই সুন্দর দেখায় যে, মনে হয় এদের সৌন্দর্যের সঙ্গে জংলি মোরগ-মুরগির কোনো তুলনাই হতে পারে না। অথচ মানব সৃষ্ট এই অরপিংটনগুলো এক হতভাগ্য প্রাণী বৈ কিছু নয়। কেননা কোনোরকম সাহায্য না করে তাদের যদি একা ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারবে না। কিন্ড়ু প্রকৃতির কোলে লালিত ও বর্ধিত বন্য মোরগ-মুরগিগুলো নিজে নিজেই বেঁচে থাকতে পারবে, সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে এবং প্রজননের মাধ্যমে অনুরূপ জাত উৎপন্ন করে তার পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে। মানুষ শুধুমাত্র নতুন জাতের মোরগ-মুরগি, ঘোড়া কিংবা কুকুরই সৃষ্টি করে না, সে নতুন মানবজাতিও সৃষ্টি করে। প্রতিটি জীবনদর্শনই সৃষ্টি করতে চায় নতুন চিন্ড়াধারা সম্পন্ন এবং নব প্রজন্মের মানবজাতি। এভাবেই আঠারো ও উনিশ শতকের পশ্চিমা দার্শনিকগণ আধুনিক শ্বেত চামড়ার জাতি সৃষ্টি করেছিলেন। ফ্যাসিস্ট জার্মানির স্রষ্টা ছিলেন নিটশে আর সোভিয়েত রাশিয়ার জাতিসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন কার্ল মার্ক্স এবং এঙ্গেলস। এসব নতুন নতুন মানবজাতিসমূহকে দেখতে যতই আকর্ষণীয় মনে হোক না কেন তাদের অবস্থা এসব কৃত্রিম মোরগ-মুরগির চেয়ে কোনো অবস্থায় ভালো নয়। বিশ্বের রাষ্ট্রনায়ক ও রাজনীতিবিদরা শেষ পর্যন্ড় মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবেন, যদি তারা নিজেদের অহমিকার বশে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে নিজেই সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করে প্রকৃতির নিয়মকানুন বাতিল করে দেন এবং মানুষকে পরিচালনার জন্যে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে যথেচ্ছ আইন প্রণয়ন করেন। মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার যথার্থ ব্যবহারের জন্যে

প্রয়োজন আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছা এবং প্রকৃতির নিয়ম—এ দুয়ের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য। অন্যকথায়, আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি এবং মানুষের সার্বভৌমত্বের অস্বীকৃতিই হতে হবে রাজনীতি দর্শনের ভিত্তি।

গণতন্ত্র

রাষ্ট্রীয় কর্মকা ে সকলের সমান অংশগ্রহণ নয় বরং রাষ্ট্রের নিকট থেকে প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন বণ্টনই হচ্ছে ইসলামি গণতন্ত্রের মূলকথা। এ গণতন্ত্র আলাপ আলোচনার পূর্ণ অধিকার দান করে এবং একইসঙ্গে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য দাবি করে। তবে এ আনুগত্য ততোক্ষণ পর্যন্তই দাবি করা হয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত প্রদত্ত সিদ্ধান্ত আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় বা মানুষের সৃষ্টি, প্রতিপালন ও বিবর্তন সম্বন্ধে অখ জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে।

অন্যান্য বিষয়সমূহের মতো, এক্ষেত্রেও পশ্চিমা সংসদীয় গণতন্ত্রের ভক্তরা পশ্চিমা ধারণার সঙ্গে ইসলামকে খাপ খাওয়াতে চান। আর এই করতে গিয়ে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের প্রতি অতিরিক্ত গুর ত্ব দেন এবং তাকেই সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ বলে ধরে নেন। গণতন্ত্রের এ সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটা যন্ত্র যার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। খলিফা মনোনীত করার পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে গণতন্ত্র সম্বন্ধে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। এটা ঐতিহাসিক সত্য নয় যে, ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা.) শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। মহানবী হজরত মুহম্মদ (সা.) এর ইন্তেকালের পর মদিনার কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় আনসার নিজেদের মধ্য থেকে একজন খলিফা নির্বাচনের জন্যে এক জায়গায় মিলিত হন। খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে আনসার ও মোহাজিরদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়ে মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্ট করতে পারে এই আশংকায় সকলের শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব হজরত আবু বকর (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে হজরত উমর (রা.) দ্র ত সে জায়গায় উপস্থিত হন। হজরত উমর (রা.) নেতৃত্বের জন্য সরাসরি হজরত আবু বকরের (রা.) নাম প্রস্তাব করেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের কোনো সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে নিজে হজরত আবু বকরের (রা.) প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। উপস্থিত অন্যান্যরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে অনুসরণ করেন। দ্বিতীয় খলিফা মনোনয়নের সময় এই নীতি অনুসৃত হয় নি। খলিফা হজরত আবু বকর (রা.) যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তিনি মদিনার নেতৃস্থানীয় লোকদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি (হজরত আবু বকর) যাঁকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে মনোনয়ন দেবেন সেই ব্যক্তিকে তাঁরা (নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ) খলিফা হিসেবে মেনে নেবেন কিনা। হজরত আবু বকর (রা.) এর প্রস্তাবে সবাই সম্মতিসূচক মতামত দিলে মুমূর্ষু খলিফা মহানুভব হজরত উমর

(রা.)কে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেন। তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান (রা.) নির্বাচিত হয়েছিলেন হজরত উমর (রা.) কর্তৃক মনোনীত ছ'জন নেতার যুক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে। নিজে খলিফা থাকাকালীন সময় হজরত উমর (রা.) পরবর্তী খলিফা কে হবেন এ নিয়ে প্রায়ই বিমর্ষ থাকতেন এবং এ নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করতেন। কিন্তু গভীর চিন্তা করেও তিনি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হন নি। এমতাবস্থায় তিনি ছ'জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির একটি প্যানেল তৈরি করেন এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে পরবর্তী খলিফা মনোনয়নের জন্যে উপদেশ প্রদান করেন। উক্ত ছ'জনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে হজরত উসমান (রা.) খলিফা মনোনীত হন। হজরত উসমান (রা.) তাঁর নিজ গৃহেই শাহাদত বরণ করেন এবং রাজনৈতিক গোলযোগের মধ্যে তাঁর খিলাফতের অবসান ঘটে। সেই গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে হজরত আলী (রা.) খিলাফতের স্বার্থে নিজে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করা কর্তব্য বলে মনে করেন এবং কোনোরকম কপটতা, ভদ্রতা বা বিনয় প্রকাশ না করে নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। দামেস্কের উমর ইবনে আব্দুল আজিজ—যিনি ইতিহাসে দ্বিতীয় উমর নামে পরিচিত তাঁকে ইসলামের পঞ্চম ন্যায়পরায়ণ খলিফা রূপে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন উমাইয়া সম্রাট সুলেমানের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তিনি সম্রাটের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। সম্রাটের কোনো পুত্রসন্তান না-থাকার কারণে সম্রাট উমর ইবনে আব্দুল আজিজকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। মনোনয়ন লাভ করে দ্বিতীয় উমর দামেস্কের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এক সভা আহ্বান করেন এবং সকলের সামনে খলিফার পদ থেকে পদত্যাগ করে নতুনভাবে নিজেদের নেতা নির্বাচনের জন্যে তাদের আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, খলিফা হিসেবে তাঁর (উমর এর) নিযুক্তি বৈধ নয়, কেননা হজরত আবু বকর (রা.) যে সততায় অনুপ্রাণিত হয়ে হজরত উমর (রা.)কে খলিফা মনোনীত করেছিলেন, এক্ষেত্রে সেরকম কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিলো না বরং নিজের পরিবারের মধ্যে খলিফার পদকে ধরে রাখার জন্যেই সম্রাট সুলেমান এ নিযুক্তি প্রদান করেছেন। কিন্তু এরপর উপস্থিত বিজ্ঞজনেরা একমত হয়ে উমর ইবনে আব্দুল আজিজকেই পুনরায় খলিফা নির্বাচন করেছিলেন।

নেতা নির্বাচনের জন্যে এসব বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য দেখা যায় এবং তা হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচন করা। হজরত মুহম্মদ (সা.) তাঁর জীবৎকালে কখনো হজরত আবু বকরকে (রা.) তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী বলে উলে- খ করেন নি, কিন্তু নানা আকার ইঙ্গিতে তিনি একথা পরিষ্কার করেছিলেন যে, তাঁর মতে হজরত আবু বকরই (রা.) এ কাজের জন্যে যোগ্যতম ব্যক্তি। অসুস্থতাজনিত বা অন্য কোনো কারণে রাসুলুল- াহ (সা.) এর অনুপস্থিতিতে রাসুলুল- াহ (সা.) এর নির্দেশে হজরত আবু বকর (রা.) নামাজের জামাতে ইমামতি করতেন। আর এ থেকেই রাসুলুল- াহ (সা.) এর অভিপ্রায় পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে হজরত উমর (রা.) এর নির্বাচনের যথার্থতা ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত

হয়েছে। হজরত উমর (রা.) এর বাহ্যিক চেহারা ছিলো রুক্ষ ও কঠিন পাথরের মতো। এ বাহ্য আকৃতির ভেতর তাঁর কোমল ও দয়ালু হৃদয়ের সন্ধান লাভ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে ছিলো প্রায় অসম্ভব। এমতাবস্থায় খলিফা হিসেবে তাঁকে নির্বাচনের প্রস্তাব ভোটে দিলে তিনি (উমর) হয়তো শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতেন। বিজ্ঞ হজরত আবু বকর (রা.) তাঁর পরবর্তী খলিফা হিসেবে হজরত উমর (রা.) এর নাম তখনই প্রস্তাব করেন, যখন তিনি নিশ্চিত হন যে, তাঁর গৃহে সমবেত নেতৃবৃন্দ তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন বলে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন। সর্বোত্তম ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে হজরত উমর (রা.) এর ব্যর্থতার পরিণাম এতো বেদনাদায়ক যে, তার ওপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। হজরত উসমান (রা.) এর শাহাদতের পর হজরত আলী (রা.) সততার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, যেসব ঘটনার জন্যে হজরত উসমান (রা.)কে শাহাদত বরণ করতে হয়েছে, সে সবের মোকাবিলা করার ক্ষমতা তিনি ছাড়া আর কারো নেই। আর এজন্যেই তিনি নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

হজরত আলী (রা.) খলিফার পদকে বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকার লাভের উপায় হিসেবে দেখেন নি বরং তিনি এ পদকে দেখেছেন একটি আমানত ও দায়িত্ব হিসেবে। খলিফা দ্বিতীয় উমরের মনোনয়ন, পদত্যাগ ও পুনর্নির্বাচন থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম নির্বাচনের পদ্ধতির চেয়ে উদ্দেশ্যের ওপরই অধিকতর গুরুত্ব দেয়। যে পদ্ধতির দ্বারা নেতা হিসেবে সর্বোত্তম ব্যক্তির নির্বাচন সম্ভব ইসলাম সেটাকেই সমর্থন করে। সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে হবে, সকল ক্ষেত্রেই এই উদ্দেশ্য থাকতে হবে, তবে অবস্থাভেদে নির্বাচনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে।

খলিফাকে পরামর্শ দেয়ার জন্যে সৎ ও যোগ্য লোকদের একটা পরিষদ ছিলো। এ পরিষদকে বলা হতো 'মজলিশে সুরা'। এই পরিষদের সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত বা নির্বাচিত হতেন না। দুধকে আলোড়িত করলে যেমন মাখন উপরে ভেসে ওঠে, ঠিক তেমনই সমাজজীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা আপনা আপনিই সাধারণ লোকদের মধ্যে শীর্ষে স্থান করে নেন। তাই উদ্দেশ্যে যদি সততা থাকে তাহলে নেতা নির্বাচন করার জন্যে কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। এ পরিষদের কাজকর্ম সাধারণত মসজিদে নববীতেই সম্পন্ন করা হতো এবং নামাজের জন্যে যাঁরা মসজিদে উপস্থিত থাকতেন তাঁদের সবার উপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। নেতৃবৃন্দ ছাড়াও যেকোনো সাধারণ লোককে পরিষদের আলোচনায় অংশগ্রহণের অবাধ সুযোগ দেয়া হতো। সংখ্যাধিক্যের ভোটের ভিত্তিতে না করে আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। কোনো ব্যক্তি বিশেষের মতও যদি যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ হতো তবে সে মতও পরিষদের মতামতের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতো এবং সে মতটাই কার্যকর হতো। এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যেতো। পরিষদ যদি কোনো একটি বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হতো তাহলে খলিফার সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে ধরে নেয়া হতো এবং এই সিদ্ধান্তের প্রতি সকলের আনুগত্য বাধ্যতামূলক ছিলো, তবে শর্ত ছিলো যে, খলিফার সিদ্ধান্ত অবশ্যই পবিত্র কুরআন ও রাসুলুল- াহ

(সা.) এর সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার এই স্বাভাবিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন সেই সমাজেই সম্ভব যে সমাজ মানুষের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে এবং আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সার্বভৌমত্বকে দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করে। কেননা একমাত্র আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতিই কার্যকর ও দক্ষতার সঙ্গে মানুষের অহমিকা ও ক্ষমতালিপ্সাকে সংযত করে অন্তর্মুখী চিন্তাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে। অন্যকথায় বলা যায়, মানুষের সুস্থ জীবনধারণ ও বিবর্তনের জন্যে সৎ ও যোগ্য লোকের মাধ্যমে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আইনকে কার্যে পরিণত করার নামই হচ্ছে ইসলামি গণতন্ত্র।

খিলাফত

মুসলিম রাষ্ট্রকে ইসলামি পরিভাষায় বলা হয় খিলাফত ও রাষ্ট্রপ্রধানকে বলা হয় খলিফা। খিলাফতের অর্থ প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ পৃথিবীতে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতিনিধিত্ব অপরদিকে খলিফার অর্থ প্রতিনিধি অর্থাৎ পৃথিবীতে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতিনিধি। সুতরাং খিলাফতের মধ্যেই মুসলিম রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায়। খিলাফত বা খলিফার কাজ জোরজুলুমের মাধ্যমে জনসাধারণের ওপর স্বেচ্ছাচারী ও প্রকৃতিবিরোধী আইনকানুন চাপিয়ে দেয়া বা সংরক্ষণ করা নয়; বরং খিলাফত ও খলিফার কর্তব্য ও করণীয় কাজ হচ্ছে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে পদ্ধতিতে তাঁর (আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার) বিস্ময়কর সৃষ্টিকে পালন করেন ও এর ক্রমোন্নতি বিধান করেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সেভাবেই বিশ্বস্ততার সঙ্গে জনসাধারণকে পালন করা ও তাদের উন্নতি বিধান করা। খলিফার পদ ক্ষমতা, বিশেষ সুবিধা ও মর্যাদা লাভের পদ নয় বরং এ পদ হচ্ছে কর্তব্য, দায়িত্ব ও আস্থাভাজনের পদ।

বিভিন্ন জাতির উত্থানপতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রকৃতির যে অমোঘ নিয়ম প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে সেটি হচ্ছে, জাতির কর্ণধারেরা যতোদিন পর্যন্ত শাসনকার্যে এসব রীতিনীতি কঠোরভাবে মেনে চলেন ততোদিন পর্যন্ত তাদের জাতি মহান, সুখী ও সমৃদ্ধ থাকে আর যখন তারা এসব রীতিনীতির প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন বা এসবের বিরোধিতা করে নিজের খেয়াল খুশিমত কাজ করেন তখন যাবতীয় রাষ্ট্রগত সম্পদের অধিকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী হওয়া সত্ত্বেও এবং সাম্রাজ্য বা নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার বিস্তৃতি সত্ত্বেও জাতি একেবারে মূল্যহীন হয়ে পড়ে। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা রাষ্ট্রকে মুসলিম শাসক বা মুসলিম রাষ্ট্র বলা যায় কিন্তু খিলাফতের ক্ষেত্রে যা সত্য তা হচ্ছে এই যে, খিলাফত বা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতিনিধিত্ব মানুষকে তখনই প্রদান করা হয় যখন মানুষ এর যথাযথ যোগ্যতা অর্জন করে। শুধু তাই নয়, যতোদিন পর্যন্ত সে তার দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করে ততোদিন পর্যন্ত তাকে এই খিলাফত ভোগ করতে দেয়া হয় আর যখন সে নিজের কাজকর্মের মাধ্যমে নিজেকে অযোগ্য প্রমাণিত করে তখনই তার কাছ থেকে খিলাফতের অধিকার প্রত্যাহার করা হয়। কলেমার প্রেরণায়

এবং হজরত মুহম্মদ (সা.) এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে যখন এক ক্ষুদ্র মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের উন্নত করে মানবতার সেই মান অর্জন করলো (যে মান তাকে পৃথিবীতে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা দান করে), কেবল তখনই আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে খিলাফত দান করলেন এবং পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করলেন—**'অতঃপর আমি ইহাদের পর পৃথিবীতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি (খলিফা নিযুক্ত করেছি), তোমরা কীরূপ কাজ করো তা দেখার জন্য' (১০ : ১৪)**। যতোদিন তাঁদের আচরণ ভালো ছিলো ততোদিন তাঁরা ছিলেন মহান। কিন্ডু যখন তাঁরা আল- াহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার সতর্কবাণী ভুলে গিয়ে তার বিপরীত কাজ করতে লাগলেন তখনই তারা ধ্বংস হয়ে গেলেন এবং দিলি- থেকে গ্রানাডা পর্যন্ড় বিস্তৃত তাদের সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের সুরম্য সমাধিসৌধে সমাহিত হতে শুর করলেন।

সাম্রাজ্যের দৃষ্টিগোচর বিস্তৃতি কোনো জাতির সঞ্জীবনীশীলতা বা শক্তির পরিচায়ক নয়। যে মুহূর্তে কোনো জাতির মধ্যে দম্ভ ও অহংকার আত্মপ্রকাশ করে এবং সে সত্য, ন্যায় ও ভারসাম্যের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় সে মুহূর্ত থেকেই সে তার জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্ডু তা সত্ত্বেও পূর্বে অর্জিত গতি অর্থাৎ জীবনীশক্তির প্রভাবে বহু বছর এমনকি বহু শতাব্দী ধরে নিজেকে ও রাজ্যকে সম্প্রসারিত করতে থাকে ও ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং পরিশেষে শেষ সীমায় পৌঁছে প্রাচুর্যের মধ্যে হঠাৎ ধ্বংস হয়ে যায়। পাঠান অথবা মুঘলদের ভারত আগমনের বহু পূর্বেই মুসলিম সমাজজীবন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো। একইভাবে পৃথিবীর শ্বেতকায় জাতিগুলোও বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ মৃত, যদিও তাদের পূর্বের গতিশীলতার কারণে (বর্তমানে গতিহীনতা সত্ত্বেও) এখনো তারা রাজ্য ও সাম্রাজ্যের বিস্ড়ার ঘটিয়ে চলছে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পূর্বে তাদের জাতীয় জীবনে প্রাণশীলতা ছিল অত্যন্ড় সজীব এবং মানুষের চিন্ড়া ও কর্মের বিবর্তনে তাদের ছিলো প্রগতিশীল ও বিপ- বাত্মক ভূমিকা। আমরা জানি চলমান অবস্থায় একটি সাইকেলের প্যাডেল ঘোরানো বন্ধ করে দিলে সাইকেলটি তৎক্ষণাৎ থেমে যায় না বরং চালকের নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও পূর্বের বেগের ধারাবাহিকতায় সেটি সামনের দিকে চলতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তার বেগ কমতে তাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে যখন তার বেগ শূন্যে নেমে আসে তখন সে থেমে যায় বা পড়ে যায়। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের আড়ম্বরের মধ্যেও জাতিসমূহের পতনের এটাই হচ্ছে আসল রহস্য, আর যারা চিন্ড়াশীল, তাঁদের জন্যে এটা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অসীম শক্তির সুস্পষ্ট নিদর্শন। ক্ষমতাবান ও প্রাচুর্যশালী লোকদের অদৃষ্টের এই পরিহাসের কথা সময়মতো স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে খুব সহজ কথায় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—**'তাদের যে উপদেশ দেয়া হয়েছিলো তারা যখন তা বিস্মৃত হলো তখন আমি তাদের জন্যে সমস্ড় কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম, অবশেষে তাদের যা দেয়া হলো সে বিষয়াদির জন্য তারা যখন উল- সিত হয়ে পড়লো তখন অকস্মাৎ তাদের ধরলাম; ফলে তখনই তারা নিরাশ হলো' (৬ : ৪৪)।**

প্রতিনিধির কাজ হচ্ছে কথায় ও কাজে বিশ্বস্ড়তার সঙ্গে নিজ প্রভুর ইচ্ছানুরূপ কাজ করা। কেউ যদি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজ প্রভুর ইচ্ছানুরূপ কাজ না করে তবে উক্ত পদ থেকে তাকে সরিয়ে দিয়ে নতুন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। তাই মানুষ যখন নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়ম বা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছার অবাধ্য হয় কিংবা তাঁর ইচ্ছা বা প্রকৃতির নিয়মের অপব্যাখ্যা করে সে অনুযায়ী তার জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় তখনই মানুষ নানারকমের দুঃখদুর্দশায় পতিত হয়। আর সম্ভবত এ সত্যের উপলব্ধি থেকেই কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছিলেন :

To her fair works did nature link.
The human soul that through me ran,
And much it grieved my heart to think
What man has made a man.

অর্থাৎ প্রকৃতি তার সুন্দর সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত করেছে মানুষের আত্মাকে। যে আত্মা আমার মধ্যে রয়েছে। আমার অন্ড়র অত্যন্ড় ব্যথিত হয় যখন আমি চিন্ড়া করি যে, মানুষ মানুষকে কী রকম করে গড়েছে

এবং

If this belief from Heaven be sent,
If such be nature's holy plan,
Have I not reason of lament
What man has made of man?

অর্থাৎ যদি এ বিশ্বাস স্বর্গ থেকে প্রেরিত হয়ে থাকে, যদি প্রকৃতির পবিত্র পরিকল্পনা এ রকম হয়, তবে মানুষ মানুষকে কী রকম করে গড়েছে এই ভেবে আমার কি দুঃখ প্রকাশ করার যুক্তি নেই?

রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা ভোগ করার ব্যাপারে সাধারণ জনগণের চেয়ে মদিনা রাষ্ট্রের খলিফাদের কোনোরূপ প্রাধান্য ছিলো না। এ ব্যাপারে তারা ছিলেন খিলাফতের (রাষ্ট্রের) অন্যান্য সাধারণ নাগরিকদের সমান। কলেমার আইন বাস্ড়বায়নের ক্ষেত্রে বিচারকের হাত থেকে খলিফাদের কোনোরূপ অব্যাহতি দেয়া হতো না। কোনো খলিফা যদি কোনো অন্যায় করতেন তবে তাকে সাধারণ নাগরিকের মতো অনাড়ম্বরভাবেই বিচারকের সামনে দাঁড় করানো হতো। খিলাফতের গভর্নরদের অপরাধের দায়ে খলিফারা সাধারণ অপরাধীর মতোই তাদেরকে শাস্ড়ি দিতেন। নিজেদের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধির জন্যে বা খিলাফতের শক্তি প্রদর্শনের জন্যে খলিফাগণ তাদের চারদিকে কৃত্রিম জাঁকজমক সৃষ্টি করতেন না। খলিফাগণ জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করতেন এবং একইসঙ্গে তাঁরা ও তাঁদের সহকর্মীরা তাদের সততা ও চারিত্র্যমাধুর্য গুণে অর্জন করেছিলেন সারা বিশ্বের মানুষের প্রশংসা, সম্মান ও ভালোবাসা। হজরত মুহম্মদ (সা.), তাঁর মহান শিষ্য ইসলামের মহান খলিফাগণ (খুলাফায়ে রাশেদীন) ছিলেন পৃথিবীতে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সত্যিকারের প্রতিনিধি। তাঁরা সাধারণ লোকের মতোই জীবনযাপন

করতেন এবং যখন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসতেন তখন পোশাকের বা আচরণের দিক দিয়ে তাঁদের অন্যান্যদের থেকে পৃথক করা যেতো না। সেকালের খলিফাগণ পারমাণবিক বা মহাজাগতিক বোমায় সজ্জিত কোনো শক্তিশালী সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সাহায্যে পারস্য বা বার্জেনটাইনের গর্ব ও অহংকার চূর্ণ করেন নি বরং তাঁরা এ কাজ করেছিলেন কলেমার শিক্ষা দ্বারা পরিস্ফুট মানুষের শক্তি ও নিজস্ব চরিত্র বলে। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পিতৃত্বসুলভ প্রভুত্ব এবং বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বের বাণী বহু পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য ও সম্রাটের ক্ষমতাকে বন্যার স্রোত যেমন খড়কুটোকে ভাসিয়ে নিয়ে নিশ্চিহ্ন করে, তেমনই নিশ্চিহ্ন করেছিলো।

অরাজকতা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আধুনিক সংজ্ঞানুসারে রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটা যন্ত্র যার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের ইচ্ছার অভিব্যক্তি ঘটে। কিন্তু জনসাধারণের ইচ্ছা বলে কিছু আছে কিনা সে বিষয়ে প্রথম থেকেই যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সভ্য ও উন্নত প্রাকৃতিক পরিবেশে যখন সমাজজীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ও উন্নতি ঘটবে, তখন জনসাধারণের ইচ্ছা বলে সত্যিসত্যি কিছু থাকবে, আর এ ইচ্ছা হবে বিভিন্ন ব্যক্তির সম্মিলিত ইচ্ছা—যা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছা বা প্রকৃতির পরিকল্পনার অনুরূপ। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী ও মানবসৃষ্ট কৃত্রিমসমাজে জনসাধারণের ইচ্ছা বলে সত্যি সত্যি কিছু নেই। সুতরাং রাষ্ট্র জনসাধারণের এমনকি অধিকাংশেরও প্রতিনিধিত্ব করে না। তবে সত্য কথা এই যে, রাষ্ট্র অল্পসংখ্যক সুসংহত ও শক্তিশালী লোকের ইচ্ছাকে ব্যক্ত করে এবং এই গুটিকয়েক লোকের কায়েমি স্বার্থ রক্ষার জন্যে ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলার অজুহাতে পরিকল্পিত বাহিনীর সাহায্যে শক্তি প্রয়োগ ও নির্যাতন করে জনসাধারণের ওপর তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়।

এই গুরুত্বের বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক দার্শনিক মনে করেন যে, রাষ্ট্র হচ্ছে সকল অনিষ্টের মূল। তাই তাদের মতে সরকারবিহীন বা রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের অনুপস্থিতি অর্থাৎ অরাজকতাপূর্ণ সমাজই হচ্ছে আদর্শ ব্যবস্থা। অনেক বিখ্যাত সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তি এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন। পে- টোর আদর্শ সমাজের কাল্পনিক রূপ এবং 'ইউটোপিয়ার' লেখক টমাস মুর এর আদর্শ সমাজের রূপ সম্পর্কে আমরা অবহিত। আমরা জানি যে, চ্যান্সেলর বেকনের কল্পনা তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো সমুদ্রের ওপারে এক কাল্পনিক মহাদেশ আটলান্টিসে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে কলেমার আদর্শে অনুপ্রাণিত মদিনার বেদুইনদের দ্বারা সত্যিকারের একটি যথার্থ অরাজকতাপূর্ণ রাষ্ট্র (বা আদর্শ রাষ্ট্র) গঠিত হয়েছিলো, এ কাহিনী বর্তমানে খুব অল্প সংখ্যক লোকেরই জানা, যদিও সে সমাজের প্রতিটি ঘটনার বিবরণ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত রয়েছে।

খিলাফত ছিলো এমন এক সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্র, যার নিজের মতামতকে জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্যে বা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যে কোনো বাহিনী ছিলো না। খিলাফতের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে, কিংবা কর আদায়ের জন্যে খিলাফতের কোনো স্থায়ী সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও কর্মচারী ছিলো না। প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকই ছিলেন এক একজন প্রচারক ও সৈনিক। বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে খিলাফতকে রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিলে জোরজুলুম করে মানুষকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার প্রয়োজন হতো না। জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ও ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং নিজেদের উদ্যোগে সামরিক দায়িত্ব পালন করতো। অপরাধীকে খুঁজে বের করার জন্যে এবং শাস্তি দেয়ার জন্যে কোনো পুলিশের প্রয়োজন ছিলো না। জনসাধারণ খুব কমই অপরাধ করতো, কেননা পাপ বা অপরাধ করলে প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের মনের ভেতরই পাপবোধ জাগ্রত হতো এবং এ পাপ বা অপরাধের শাস্তিবিধানের জন্যে নিজ অন্তরেই নিজস্ব সতর্ক পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা ছিলো। মানুষ যখন কোনো অপরাধ করতো তখন সে স্বেচ্ছায় খলিফা বা যোগ্য বিচারকের সামনে উপস্থিত হয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করতো এবং শাস্তি গ্রহণ করে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে তুলতো। কলেমা তাদের এই স্বাভাবিক ও মহৎ নীতিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলো যে, মানুষ যেসব অপরাধ করে তা সে তার নিজ আত্মার বিরুদ্ধেই করে এবং আইনের শাসন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর অর্থ নিজ আত্মার সঙ্গে প্রতারণা বা নিজ আত্মার ওপর জুলুম। রাসুল (সা.) এর জামানায় যৌন ব্যভিচারের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও এক সুশ্রী যুবক নিজ রিপুকে দমন করতে না পেরে যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। কিন্তু আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আইন অমান্য করার বেদনা তাকে ভীষণভাবে পীড়া দিতে থাকলো। তাই সে সরাসরি হজরত মুহম্মদ (সা.) এর দরবারে হাজির হয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করলো এবং ক্ষমা ভিক্ষা না করে আইন অনুযায়ী শাস্তিবিধানের জন্যে প্রার্থনা করলো। সেই সাহসী যুবক প্রার্থনা করলো, 'হে আল- াহ'র রাসুল (সা.), আমি ব্যভিচার করেছি, আমাকে পবিত্র করুন'। যুবকটির অল্প বয়স ও সুন্দর চেহারা দেখে হয়তো হজরত মুহম্মদ (সা.) মনে সহানুভূতির সঞ্চার হলো। তাই তিনি (সা.) যুবকের কথা শুনেন নি এরূপ ভান করে মুখ ডান দিকে ফিরিয়ে নিলেন। যুবক রাসুল (সা.) এর ডান দিকে এসে তাকে পবিত্র করার জন্যে পুনরায় আবেদন জানালো। রাসুল (সা.) পুনরায় না শোনার ভান করে বামদিকে মুখ ফেরালেন। যুবকটি তখন রাসুল (সা.)-এর বামদিকে গিয়ে পুনরায় একই আবেদন জানালো। তখন রাসুল (সা.) যুবকটিকে একজন সাহাবার কাছে সোপর্দ করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে নির্দেশ প্রদান করলেন। ঠিক তখনই রাসুল (সা.) কাছে প্রত্যাদেশ (ওহি) এলো—**'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী- এদের প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত করবে, আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল- াহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটি দল যেনো তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।' (২৪ : ২)'**।

আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই নির্দেশে অনুপ্রাণিত হয়েই হজরত উমর (রা.) ব্যভিচারের দোষে অপরাধি নিজ পুত্রকে স্বহস্তে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং সে বেত্রাঘাতের আঘাতে জর্জরিত হয়ে পুত্রের মৃত্যু ঘটেছিলো। কলেমার আইন অনুযায়ী ব্যভিচার হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণ্য সমাজবিরোধী অপরাধ। ইসলামি আইন সাধারণ নাগরিক, খলিফা বা খলিফাপুত্র সকলকে সমানভাবে শাসন করতো। আর তাইতো আইনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য প্রদানে এবং কোনো বাহিনীর শাসন ছাড়াই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে মানুষ অনুপ্রাণিত হতো। এই একই ন্যায়বোধ থেকে খাজনা ও অন্যান্য দেয় কর জনসাধারণ নিজেরাই স্বেচ্ছাকৃতভাবে 'বায়তুল মাল' বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতো। খাজনা বা অন্যান্য কর আদায় করার ব্যাপারে খলিফা বা খিলাফতের অন্য কোনো কর্মচারির কোনো দায়দায়িত্ব ছিলো না। তবে জনগণ কর্তৃক স্বেচ্ছাকৃতভাবে জমাকৃত সম্পদ যাতে জনগণের কল্যাণার্থে ব্যবহৃত হয় সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিলো।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, আইন ও নৈতিকতার পারস্পরিক সংযোগ না ঘটলে সত্যিকারের অরাজকতা সম্ভব নয়। কিন্তু আইন ও নৈতিকতা উভয়ই যদি মানবপ্রণীত হয় তবে তাদের সংযোগে আদর্শসমাজ অর্থে অরাজকতা সৃষ্টি হবে না, বরং সৃষ্টি হবে সেই অরাজকতা যেখানে থাকবে আইন ও শৃঙ্খলার প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ও অবহেলা। কেননা মানবপ্রণীত প্রকৃতিবিরোধী জীবনদর্শনের ওপর ভিত্তি করে যে আইন ও নৈতিকতা সৃষ্টি হয় সেটা কখনো স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য সৃষ্টি করতে পারে না। প্রাকৃতিক জীবনদর্শনের মূলতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে যে আইন ও নৈতিকতা গড়ে ওঠে, একমাত্র তাদের সংযোগেই আদর্শ সমাজ অর্থে সত্যিকারের অরাজকতা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কলেমার শিক্ষা মানুষকে একতার শিক্ষা দেয় এবং একীভূত জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে আইন ও নৈতিকতার স্বাভাবিক ভিত্তিস্থাপন করে। এই আইন ও নৈতিকতা বিশ্বস্তড়তার সঙ্গে মানবপ্রকৃতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায় এবং প্রাকৃতিক আইন ও নৈতিকতার উৎসমুখ কলেমার মধ্যে মিলিত ও সমপাতিত হয়।

রাষ্ট্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একজন খলিফা, গুটিকয়েক প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও বিচারক নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে মদিনার খিলাফত ছিলো আদর্শ সমাজ অর্থে অরাজকতার বাস্তব ও চরম রূপ। যতোক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ কৃত্রিম সভ্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে প্রকৃতির কোলে ফিরে আসবে ততোক্ষণ পর্যন্ত আদর্শ সমাজ অর্থে পূর্ণাঙ্গ অরাজকতা সৃষ্টি হবে না। বাইবেলে বর্ণিত 'ইডেনের বাগানে' মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনযাপন করতো। কিন্তু যখন তার গর্ব ও অহমিকাবোধের প্রভাবে সে কৃত্রিমজীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হলো তখনই তার স্বর্গচ্যুতি ঘটলো। স্বর্গ থেকে পতনের পর থেকেই মানুষ অনবরত চেষ্টা করছে প্রকৃতির কোলে ফিরে গিয়ে তার হারানো স্বর্গ পুনরুদ্ধার করতে। কিন্তু কৃত্রিমজীবনের শৃঙ্খল তাকে এমন দুষ্টচক্রের মধ্যে আবদ্ধ করেছে যাতে করে প্রকৃতির কোলে ফিরে যাওয়া তার জন্যে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদর্শসমাজ অর্থে অরাজকতাই যে জীবনের সব থেকে পূর্ণাঙ্গ ও

সুস্থ ব্যবস্থা মানুষের এই উপলব্ধি মানবজাতির মতোই প্রাচীন। এটা নতুন কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নয়।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মানুষ কীভাবে নিজের দুঃখদুর্দশা নিজেই ডেকে এনেছিলো, ঘোড়া, কাদামাটি ও কাঠের উপমা দিয়ে, দু'হাজার বছর আগে চীনা দার্শনিক চুয়াং জু তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন :

বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে চলার জন্যে ঘোড়ার ক্ষুর আছে, বাতাস ও শীত থেকে রক্ষা করার জন্যে তার লোম আছে। তারা ঘাস খায় ও পানি পান করে এবং ক্ষুরের ওপর ভর দিয়ে সমতল ক্ষেত্রে চরে বেড়ায়। এটাই ঘোড়ার প্রকৃত স্বভাব, প্রাসাদতুল্য বাসস্থান, তাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

একদিন এক সহিস পো লো দাবি করলো, 'ঘোড়াকে কীভাবে শাসন করতে হয় তা আমি জানি'। তাই তার জ্ঞান অনুযায়ী সে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে ঘোড়াগুলোকে দাগাংকিত করলো, তাদের লোম ছেটে দিলো, ক্ষুরকে বিভক্ত করে দিলো, ফাঁস রশি দিয়ে গলাকে বেঁধে দিলো এবং পায়ে শিকল পড়িয়ে আস্তাবলে বেঁধে রাখলো। এর ফলে প্রত্যেক দশটির মধ্যে দু'তিনটি করে ঘোড়া মারা গেলো। তারপর সে বাকি ঘোড়াগুলোকে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রেখে কখনো জোর কদমে আবার কখনো দুলকি চালে চালিয়ে, মুখে শক্ত লাগাম এবং পেছনে কাঁটাযুক্ত চাবুক মেরে সহিসগিরি করে তাদের অবস্থা এমনই কাহিল করলো যে, তাদের অর্ধেকেরও বেশি মারা গেলো। এভাবেই সে ঘোড়াকে শাসন করলো।

কুমার এসে দাবি করলো, 'আমি কাদামাটি দিয়ে যা ইচ্ছা তা তৈরি করতে পারি। একে গোলাকার করতে চাইলে কম্পাস এবং চতুষ্কোণাকার করতে চাইলে স্কোয়ার ব্যবহার করি'। ছুতার দাবি করলো, 'আমি কাঠ দিয়ে যা ইচ্ছা তা তৈরি করতে পারি। একে বাঁকা করতে চাইলে ব্যবহার করি চাঁদা বা চাপ এবং সোজা করতে চাইলে ব্যবহার করি লাইন'। কিন্তু কীসের ওপর ভিত্তি করে আমরা এটা বলতে পারি যে, কাদার প্রকৃতি কম্পাস বা স্কোয়ারের এবং কাঠের প্রকৃতি চাঁদা বা লাইনের ব্যবহার চায়? এটা অবশ্যই তাদের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে আমরা বলে থাকি। তথাপি ঘোড়া, কাদা ও কাঠের প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে প্রত্যেক যুগেই ঘোড়াকে শাসন করার জন্যে পো লো'র এবং কাদা ও কাঠের কাজের নৈপুণ্যের জন্যে কুমার ও ছুতারের কর্ম নৈপুণ্যের প্রশংসা করা হয়ে থাকে। একইভাবে যারা সাম্রাজ্য শাসন করেন তারাও মানবপ্রকৃতিকে উপেক্ষা করে তাদের কর্মকাণ্ডকে সঠিক মনে করে এই একইরকম ভুল করেন। এখানেই আমি সাম্রাজ্যের নিয়োজিত সরকারকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি।

মানুষের কিছু সংখ্যক সহজাত প্রবৃত্তি আছে–যেমন সুতা কেটে কাপড় বুনন, চাষাবাদ করে আহার সংগ্রহ করা। এগুলো সব মানুষের জন্যেই প্রযোজ্য এবং এতে সবাই একমত। এরূপ প্রকৃতিকে বলা হয় 'স্বর্গ-প্রেরিত'। তাই মানুষের মনে যখন এসব সহজাত প্রবৃত্তিগুলো কার্যকর ছিলো তখন সে নিশ্চিন্ত মনে চলাফেরা করতো আর অপলক দৃষ্টিতে অবলোকন করতো। সে সময় পাহাড়ের ওপর কোনো রাস্তা ছিলো না, নদীর

উপর কোনো সেতু ছিলো না বা পানিতে নৌকা চলতো না। প্রতিটি বস্তুই তৈরি করা হতো তার নিজস্ব পরিমণ্ডলের জন্যে। ধীরে ধীরে পশুপাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো, বৃক্ষ ও গুল্ম তাদের বিস্তার ঘটাতে থাকলো। কিন্তু তবু সে সময় পর্যন্ত পশুপাখিকে হাতের ইশারা-ইঙ্গিতে পরিচালনা করা যেতো, মানুষ গাছে চড়ে দাঁড়কাকের বাসায় উঁকিমারতে পারতো, কেননা তখন সমস্ত সৃষ্টি ছিলো একক সত্তা এবং মানুষ পশুপাখির সঙ্গেই বসবাস করতো। ভালো ও মন্দ লোকের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিলো না। সকলে একইরূপ জ্ঞানহীন থাকার কারণে তাদের সৎ কাজ করার শক্তি বিপথে পরিচালিত হতে পারতো না। মন্দ প্রবৃত্তি থেকে সকলে সমানভাবে মুক্ত থাকায় তাদের মধ্যে ছিলো প্রাকৃতিক অখণ্ডতা বা স্বাভাবিক সততা। আর এটাই ছিলো মানবজীবনের পূর্ণতা।

চুয়াং জু এর বক্তব্য: 'মুনিঋষিরা আবির্ভূত হয়ে যখন দান খয়রাতের জন্যে মানুষকে উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং প্রতিবেশির প্রতি কর্তব্যের কথা বলে তাদের শৃঙ্খলিত করলেন তখনই সন্দেহ এসে পৃথিবীতে নিজের আসন গেড়ে বসলো। অতঃপর, সঙ্গীতের প্রবল প্রবাহ এবং পূজা পার্বণের বাহ্য আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্য নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত হয়ে পড়লো'—এ ধারণাকে কোনো মতেই সঠিক বলে ধরে নেয়া যায় না। কেননা প্রকৃত বিষয়টি অন্যরকম। মানুষ কৃত্রিমজীবনের বিষাক্ত আবহাওয়ায় প্রবেশ করে নিজের ওপর অভিশাপ ডেকে আনার পরই মুনিঋষিদের আবির্ভাব ঘটেছে, তার আগে নয়। একটা মন্দ ব্যবস্থাকে যতোটুকু ভালো করা সম্ভব তা করতেই মুনিঋষিদের আবির্ভাব। তারা মানুষকে তার আদি প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন এবং কী ধরনের আচরণ করলে মানুষ তার হারানো স্বর্গকে পুনরুদ্ধার করতে পারবে সে শিক্ষা দেন। পৃথিবীতে যদি মুনিঋষিদের আবির্ভাব না ঘটতো তাহলে মানবজাতি লাখ লাখ বছর আগেই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।

প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জন্যে মুনিঋষি বা পয়গম্বরের প্রয়োজন ছিলো না, কারণ প্রকৃতির সঙ্গে তখন মানুষের পূর্ণ সমন্বয় বা ঐক্য ছিলো এবং সে জন্যে প্রতিটি মানুষই ছিলো এক একজন ঋষি বা পয়গম্বরতুল্য ব্যক্তি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন স্পষ্টভাবে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পায় তারাও তেমনই স্পষ্টভাবে আল- াহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ও তাঁর নিয়মকানুনের উপস্থিতি অনুভব করতেন। কলেমা আদর্শসমাজ অর্থে একটি বাস্তব অরাজকতাপূর্ণ সমাজের সৃষ্টি করেছিলো এবং এর দ্বারা ধীর গতিতে এবং ক্রমান্বয়ে কীভাবে পূর্ণাঙ্গ আদর্শসমাজ তথা পূর্ণাঙ্গ অরাজকতা অর্জন করা যায় তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান করেছিলো।

আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সার্বভৌমত্ব আরববাসীকে সব মানবিক প্রভুত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছিলো এবং কলেমার নতুন জাতীয়তা তাদের দিয়েছিলো বিশ্বনাগরিক হওয়ার অধিকার। রাজনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি হিসেবে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সার্বভৌমত্বের সর্বজনীন স্বীকৃতিই হচ্ছে কলেমার আসল লক্ষ্য। অপরদিকে কলেমার আদর্শ আরববাসীকে শুধু স্বেচ্ছাচারী আইন ও আধিপত্যের রাজনৈতিক দাসত্ব থেকেই মুক্তি দেয় নি বরং তাদের মধ্যে এক জ্বলন্ত বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছিলো যে, বৈদেশিক শক্তি দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে পৃথিবীর সবজাতির সবমানুষের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করার অধিকার রয়েছে। অপরের স্বাধীনতাকেও তারা নিজেদের স্বাধীনতার মতোই গভীরভাবে ভালোবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো। কলেমা তার আদর্শকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অন্যের নিকট প্রচার করাকে বিশ্ববাসীর জন্যে বাধ্যতামূলক করেছিলো। কিন্তু কলেমা বিশ্বমানবতার মুক্তি ও স্বাধীনতার যে তাৎপর্য সৃষ্টি করেছিলো তাতে কলেমার স্বপক্ষীয় সমাজব্যবস্থা ও আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সার্বভৌমত্বকে জোরজুলুম, শক্তি প্রয়োগ বা সন্ত্রাসের মাধ্যমে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কোনো অধিকার মুসলমানদিগকেও দেয় নি। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—**'দ্বীন সম্পর্কে জোরজবরদস্তি নাই' (২:২৫৬)**। যদিও কলেমা নিশ্চিতভাবে মানুষের জীবনে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আইনের সর্বজনীন স্বীকৃতি এবং সমগ্র পৃথিবীর জন্যে একটিমাত্র সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে স্থির নিশ্চিত, তবু কলেমা যেকোনো কারণের জন্যেই হোক না কেন শক্তি প্রয়োগ বা আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে ঘৃণা করে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের নীতিতে বিশ্বাস করে বলেই কলেমা জোরজুলুম, আক্রমণ ও সন্ত্রাসের কাছে নতি স্বীকার করাকে এমন কঠোরভাবে নিন্দা করে যেমন নিন্দা করে অন্যকে পরাভূত করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করাকে বা আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে।

পবিত্র কুরআন আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিকে পুরাপুরি স্বীকার করে। তাই আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে উদাসীন বা অমনোযোগী না থাকার জন্য বিশ্বাসীদিগকে পবিত্র কুরআন সাবধান করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে—**'তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্যে যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদের তোমরা জান না, আল- াহ তাদের জানেন। আল- াহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে এর পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।' (৮ : ৬০)**। পুনরায় বলা হয়েছে—**'হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যখন কোনো দলের সম্মুখীন হবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল- াহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও' (৮ : ৪৫)**। সুতরাং কলেমা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের শুধু অনুমতিই দেয় নি বরং এ রকম যুদ্ধ সকলের জন্যে বাধ্যতামূলক করেছে। কারণ শক্তি ও আক্রমণের কাছে নতি স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলার সার্বভৌমত্ব এবং প্রভুত্বের পরিবর্তে মানুষের কৃত্রিম প্রভুত্বকে স্বীকার করা আর কলেমার শিক্ষাকে অস্বীকার করার সামিল।

যেহেতু প্রতিটি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধই স্বভাবত নিজের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্যে তাই এতে ঘৃণা, প্রতিহিংসা বা অন্যের স্বাধীনতা খর্ব করার কোনো প্রবণতা নেই। এজন্যেই সন্ধির শর্ত খুব সম্মানজনক না হলেও সন্ধির প্রস্তাব পাওয়ামাত্র যুদ্ধ বন্ধ করা বাধ্যতামূলক। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আপনিও সেদিকেই আগ্রহী হোন এবং আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ওপর নির্ভর করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' (৮ : ৬১)**। প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা কখনো আক্রমণাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হতেন না কিন্তু আক্রমণকে তাঁরা সব সময় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করতেন এবং শান্তির নীতির প্রতি তাঁদের অবিচল আস্থা থাকার কারণে শত্রুর কাছ থেকে সন্ধির প্রস্তাব পাওয়া মাত্র তাঁরা তাঁদের তরবারি কোষবদ্ধ করতেন। 'হোদায়বিয়ার সন্ধি' হচ্ছে এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সন্ধি চুক্তি রাসুলে করিম হজরত মুহম্মদ (সা.) নিজে সম্পাদন করেছিলেন ঠিক সেই সময় যখন মক্কা নগরীর যুদ্ধপ্রিয় আক্রমণকারী সৈন্যগণ মুসলমানদের হাতে প্রায় পরাজিত হতে যাচ্ছিলো। কিন্তু সন্ধির প্রস্তাব পাবার পর রাসুল (সা.) কোরাইশদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হন, যদিও সন্ধির শর্তসমূহ মুসলমানদের পক্ষে খুব সম্মানজনক ছিলো না।

মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসাকে পুণ্যের কাজ বলে স্বীকার করে নিয়েও মানুষের বিশ্বজনীন জাতীয়তা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষকে বিশ্বনাগরিকত্বের অধিকার প্রদান করে এবং এভাবেই আঞ্চলিক জাতীয়তার অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করে। যেসব জীবনদর্শন আঞ্চলিক জাতীয়তা ও কৌলীন্যগত দম্ভকে লালন করে কিংবা উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে প্রশ্রয় দেয়, বিশ্বজনীন জাতীয়তা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব সেসব দর্শনকে বাতিল করে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে।

যুদ্ধ বিষয়ে কলেমার একটা নিজস্ব নীতিবোধ রয়েছে। কলেমায় যে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কথা বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন 'রব' অর্থাৎ পালনকর্তা ও পোষণকর্তা। তাই আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সৃষ্ট জীবের পোষণের জন্যে পৃথিবীপৃষ্ঠের উর্বর মাটি, যেখানে খাদ্য উৎপন্ন হয় তাকে রক্ষা করা অতীব জরুরি। কেননা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করলে প্রকারান্তরে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। গির্জা, সিন্যাগগ ও মঠগুলো হচ্ছে উপাসনা ও ধর্মীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র। সহিষ্ণুতা, বিবেকের স্বাধীনতা এবং বিশ্বাস কলেমার অনুসারীদের অন্যের বিশ্বাস, উপাসনা ও বিবেকের স্বাধীনতাকে ভালোবাসতে এবং শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। তাই তারা নিজের উপাসনাস্থলের মতো অন্যের উপসনাস্থলকেও পবিত্র বলে বিবেচনা করেন। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বলতে আক্রান্ত হলে যুদ্ধকে বুঝায়। সুতরাং আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য অস্ত্রধারণ করতে হলে সত্যিকারের আক্রমণকারীর বিরুদ্ধেই শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, যারা আক্রমণকারী নয়—যেমন স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ তাদের শান্তি ও

নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটানো যাবে না। মদিনার খলিফাগণ প্রতিটি যুদ্ধের প্রাক্কালে নিজ সৈন্যদের প্রতি এ নির্দেশ প্রদান করতেন। এমনও দেখা গেছে যে, তারা যুদ্ধগামী সৈন্য দলের সঙ্গে রাজধানী মদিনার প্রান্তসীমা পর্যন্ত গমন করতেন এবং এই উপদেশ দিতেন যে, 'গির্জা, সিন্যাগগ ও মঠসমূহকে কখনো অপবিত্র করোনা, পাদরি এবং সাধু-সন্যাসীদের আঘাত করো না, স্ত্রীলোক, শিশু, রুগ্ণ ব্যক্তি এবং বৃদ্ধলোকদের হত্যা করো না; জমির ফসল, আঙ্গুর ক্ষেত, ফলের বাগান ও বৃক্ষাদি নষ্ট করো না'। যুদ্ধ ও শান্তির এ নীতিগুলো কলেমার শিক্ষারই অঙ্গ ছিলো এবং এ বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের মনমানসিকতা গড়ে ওঠতো এবং এ বিশ্বাসই তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতো। এই বিশ্বাস তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছিলো, যার ফলে সারা বিশ্ববাসীর মনে যুগপৎ ভয় আর শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়েছিলো। পরবর্তী যুগের সাম্রাজ্যবাদী আরবদের যুদ্ধ বিগ্রহের প্রকৃতি যা-ই হোক এবং ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ডের ক্রুসেডের প্রকৃতিও যা-ই হোক না কেন, কলেমার শিক্ষা অনুযায়ী জিহাদ হচ্ছে একমাত্র আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ।

সপ্তম অধ্যায়

অর্থনৈতিক বিপ- ব

বস্ড়ুগত সম্পদের মালিকানা

কলেমার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ- ব মানুষের অর্থনৈতিক জীবনেও যুগান্ড়কারী পরিবর্তন এনেছিলো। এক আল- াহ, এক মানবজাতির ধারণা, সমান সামাজিক মর্যাদা এবং সমান রাজনৈতিক সুখ-সুবিধার অধিকার এমন এক সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দেয় যেখানে পৃথিবীর বস্ড়ুগত সম্পদ ভোগ করার অধিকার সকলের সমান থাকে। কলেমায় যে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কথা বলা হয়েছে, যিনি বিশ্বের পালনকর্তা, একমাত্র তিনিই হচ্ছেন বিশ্বের সকল বস্ড়ুগত সম্পদের একচ্ছত্র মালিক। ধনসম্পদের ওপর মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, একক বা যৌথ কোনো ধরনের মালিকানাই কলেমার শিক্ষা স্বীকার করে না। কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'আসমান ও জমিনের এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে তার সার্বভৌমত্ব (মালিকানা) আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলারই' (৫ : ১৮)**। বস্ড়ুগত সম্পদের মালিকানার ব্যাপারে এটাই আল কুরআনের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ড়। নিজের আয়ত্তে রেখে সম্পদ ভোগদখলের অধিকার মানুষের আছে কিন্ড়ু এ ভোগদখল করতে হবে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে এবং শুধুমাত্র সকল মানুষের কথা চিন্ড়া করে নয় বরং সৃষ্ট সকল জীবের ভরণপোষণের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) নিযুক্ত করেছেন এবং যাহা তিনি তোমাদের দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্ড়ি প্রদানে দ্র"ত আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময়' (৬ : ১৬৫)**।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজের আহার্য সংগ্রহ করার অধিকার মানুষের যেমন রয়েছে ঠিক তেমনই জন্মগতভাবে সে অধিকার রয়েছে স্রষ্টার প্রতিটি সৃষ্টির। প্রকৃতি এবং তার কর্মকা"ের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এ উক্তির পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। প্রকৃতির বুকে যেসব জীবজন্ড়ু বিচরণ করে তারা সকলেই কাজ করে এবং এর মাধ্যমে তাদের জৈব প্রয়োজন মেটায়। তাদের যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকুই তারা পায় এর বেশি কিছু পায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাতির প্রয়োজন বেশি, তাই সে বেশি পায়, অপরদিকে পিঁপড়ের প্রয়োজন কম তাই সে কম পায়। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নিজের গুণের মাধ্যমেই প্রকৃতিতে নিজেকে ব্যক্ত করেন। পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াতেই আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বের 'রব' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকারী হিসেবে। 'রব' আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণবাচক নাম। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল- াহ

সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অন্যান্য গুণবাচক নামগুলোকে বিশে- ষণ করলে দেখা যাবে সেগুলোও শেষ পর্যন্ড় এই (রব) নামের মধ্যে এসে মিশে গেছে।

পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় আয়াতে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেকে 'রহমান' ও 'রহিম' বলে প্রকাশ করেছেন। রহমান তাঁকেই বলা হয় যিনি তাঁর সৃষ্ট জীবদের প্রয়োজন পূর্ব থেকেই অনুমান করে নিজ গুণেই সেসব জিনিস মুক্তহস্ড়ে দান করেন, এসব জিনিস তারা নিজেদের চেষ্টায় তৈরি করতে পারে না। এসব জিনিসকে অর্থনীতির পরিভাষায় বলা হয় প্রকৃতির দান—যেমন বাতাস, পানি, মাটি ইত্যাদি। অপরদিকে তিনিই 'রহিম' যিনি তাঁর প্রদত্ত প্রতিটি অমূল্য জিনিসের সদ্ব্যবহারকারীকে পুরস্কৃত করেন। অন্যকথায় বলা যায়, প্রকৃতির অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যেই এমন ব্যবস্থা বিদ্যমান যে, প্রতিটি জীব প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য সবরকমের উপকরণ ও সুযোগ সুবিধা পায় এবং তার কাজের বা শ্রমের ফলস্বরূপ যা পায় তা দ্বারা তার প্রয়োজন পরিতৃপ্ত হয়। পবিত্র বাইবেলের ভাষায় বলা যায়, প্রকৃতি সবাইকে 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের আহার সংগ্রহ করার' অধিকার ও সুযোগ দান করে।

প্রাকৃতিক অবস্থায় উৎপাদন যন্ত্রের ওপর সৃষ্টির কোনো মালিকানা স্বত্ব নেই, কিন্ড়ু তবু তারা প্রকৃতি প্রদত্ত এসব যন্ত্রগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করার পূর্ণ অধিকার রাখে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ধনসম্পদ উৎপাদন, ব্যবহার ও বিতরণের ক্ষেত্রেও মানুষ আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছা তথা প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত কাজ করে মানুষ তার জীবনের সকল দুঃখ ও দুর্দশা ডেকে এনেছে। এর চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক যে, আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নিজ গুণে মানুষকে যে বুদ্ধি ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার দম্ভ ও অহংকারে মানুষ প্রকৃতির বির"দ্ধে যে বিদ্রোহ করে সে বিদ্রোহের পাপ সম্পর্কে সে (মানুষ) সচেতন থাকে না এবং আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে তার (মানুষের) ঘোরতর শত্র" বলে মনে করে। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বির"দ্ধে এই সর্ব ব্যাপক যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজের বির"দ্ধেই যুদ্ধ। তাই এই যুদ্ধকে প্রতিরোধ না-করলে মানুষের দুর্দশা ও বিনাশ চরম পর্যায়ে পৌঁছবে এবং পরিশেষে মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে কলেমার শিক্ষা হচ্ছে, পৃথিবীতে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ নিজের বিষয় কর্মে, প্রকৃতিতে দৃশ্যমান আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অর্থনীতির অনুসরণ করবে। সে কোনো সম্পদের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না তবে নিজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সকলের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে মানুষ পৃথিবীর সম্পদ ভোগদখল করতে পারবে।

উৎপাদন যন্ত্রের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা অপরের উদ্বৃত্ত-শ্রম-মূল্য শোষণের একটি উপায়। অনুরূপভাবে কোনো জাতির জাতীয় সম্পদের ওপর বা উৎপাদন যন্ত্রের ওপর সে জাতির মালিকানা অন্য জাতিকে শোষণ করার উপায়। এই কারণে সমগ্র পৃথিবীর সম্পদের ওপর সমগ্র মানবজাতির যৌথ মালিকানা পৃথিবীর অন্যান্য জীবজন্ড়ুর জন্যে ভীতিকর। আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে সমাজতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে, সম্পদে ব্যক্তিগত

মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা। কিন্তু কলেমার শিক্ষা অনুসারে সমাজতন্ত্রের অর্থ সম্পদের মালিকানা ব্যক্তির হাত থেকে সমাজ বা সম্প্রদায়ের নিকট হস্তান্তর করা নয়। ইসলামের অর্থনৈতিক বিশ্বজনীনতা পৃথিবী বা তার কোনো অংশের ওপর মানুষের মালিকানাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে এবং ব্যক্তি, সমাজ বা সম্প্রদায়কে নিজের প্রকৃত প্রয়োজন মেটানোর জন্যে শুধু ভোগদখলেরই অধিকার দেয়। তবে এ ভোগ দখলও বল্গাহীন নয়। এ ভোগদখলের ক্ষেত্রেও অপরাপর ব্যক্তি ও সমাজের যথার্থ প্রয়োজন মেটানোর অধিকারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। সুতরাং কলেমার শিক্ষা অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে সম্পদের সামাজিক ভোগদখল ও ব্যবহারের অধিকার—যা হচ্ছে ব্যক্তিগত বা সামাজিক মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেসব দুঃখদুর্দশা বিশ্বের শান্তি ও ঐক্যকে ব্যাহত করছে তার কোনোটিই দূর হবে না, যদি না মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের সুষম বা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করে। আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিজের বদান্যতা ও উদার দানশীলতার গুণে সুন্দর পৃথিবীকে তাঁর সৃষ্ট জীবের ব্যবহার ও উপভোগের জন্যে ফুলে, ফলে এবং শস্যে ভরপুর করে রেখেছেন। সীমা লঙ্ঘন না-করা পর্যন্ত কোনো জীব এ দান থেকে বঞ্চিত হয় না। মানুষের জীবনের কর্মকাণ্ডে ন্যায়সঙ্গত সমতা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে—**'এবং তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্যে; এতে রয়েছে ফলমূল, খেজুর বৃক্ষ, যার ফল আবরণযুক্ত এবং খোসা বিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধি ফুল। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?' (৫৫:১০-১৩)।**

সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির প্রয়োজন পরিতৃপ্তির জন্য দরকার হলে ব্যক্তির প্রয়োজন পরিতৃপ্তির পর তার দখলে যা কিছু উদ্বৃত্ত সম্পদ থাকে সেটা সমাজের অধিকারে ছেড়ে দিতে হবে। একইভাবে প্রত্যেক সমাজ ও সম্প্রদায়েরও দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে কোনোরূপ দরকষাকষি না করে তার উদ্বৃত্ত অংশ অপরাপর অভাবগ্রস্ত সমাজের কাছে হস্তান্তর করা। তাই বলা যায়, মানুষের কর্তব্যই হচ্ছে নিজের উদ্বৃত্ত অংশ অন্য মানুষ বা অন্যান্য সৃষ্ট জীবের জন্যে ছেড়ে দেয়া।

প্রয়োজনের আবার ধরাবাঁধা কোনো সীমা নেই, এটা আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল। ধনতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী সমাজে কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন নির্ধারিত হয় তার নিজের সমপর্যায়ের মানুষের জীবনযাত্রার মান অনুসারে এবং সমাজের প্রগতির সঙ্গে প্রয়োজনেরও পরিবর্তন হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ একজন মহারাজা, নবাব বা ডিউকের প্রয়োজন নির্ধারিত হয় তার নিজ শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার মান অনুসারে। অপরদিকে, তার নিজ শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রার মান অনুসারে একজন শ্রমিকের প্রয়োজন নির্ধারিত হয় না বরং তা নির্ধারিত হয় তার কাজের পরিমাণ অনুসারে। তাই একজন কারখানা শ্রমিকের প্রয়োজনের সঙ্গে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রয়োজনের আকাশ পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এভাবে কোনো সমাজ বা জাতির প্রয়োজন নির্ধারিত হয় সমমানের অন্যান্য জাতির প্রয়োজনের মাপকাঠিতে এবং পৃথিবীর প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এটাও

পরিবর্তিত হয়। ইংল্যান্ডের জাতীয় প্রয়োজন ফ্রান্স ও জার্মানির খুব কাছাকাছি এবং আফগানিস্তান বা পারস্যের মতো দেশের চেয়ে অনেক বেশি। আবার ইংল্যান্ডের জাতীয় প্রয়োজন পৃথিবীর প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমান ইংল্যান্ডের চেয়ে পঞ্চাশ বছর আগেকার ইংল্যান্ডের প্রয়োজন অনেক কম ছিলো। ধনতন্ত্রের প্রতিপক্ষ বা ধনতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র উৎপাদন যন্ত্রের ওপর মানুষের মালিকানা বিলুপ্ত করে না শুধু এই মালিকানা ব্যক্তির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সমাজ কিংবা জাতির কাছে হস্তান্তর করে এবং সমাজ বা জাতির একজন সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান অনুসারে ব্যক্তিগত প্রয়োজন নির্ধারণ করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে যেমন আচরণ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও এক জাতি অপর জাতির সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করে। কিন্তু কলেমার শিক্ষা অনুযায়ী ব্যক্তিগত প্রয়োজন নির্ধারিত হয় সমাজের একজন সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান অনুসারে এবং সামাজিক ও জাতীয় প্রয়োজন নির্ধারিত হয় পৃথিবীর সাধারণ সভ্য জাতিদের জীবনযাত্রার মাপকাঠিতে।

আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত অর্থনৈতিক মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কলেমার অনুসারীরা এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে সমাজের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও (খলিফা) সাধারণ জনগণের সঙ্গে খিলাফতের সম্পদ সমানভাবে ভোগ করতেন। কলেমা মানুষকে শিক্ষা দেয় আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পিতৃত্বসুলভ প্রভুত্ব এবং বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব। যখন সকলের প্রয়োজন মেটানোর মতো সামর্থ সমাজ তথা রাষ্ট্রের থাকে ইসলামি সমাজব্যবস্থায় তখন প্রত্যেকে নিজের নিজের প্রয়োজন মতো সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পায় আর যখন সকলের চাহিদা পূরণের মতো সম্পদ সমাজের বা রাষ্ট্রের থাকে না তখন যা কিছু আয়ত্তের মধ্যে থাকে এক পিতার সন্তান হিসেবে সেগুলোকে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হয়। খলিফা উমর (রা.) ছিলেন লম্বা চওড়া মানুষ। তাই নিজের জামা তৈরি করার জন্যে সাধারণ উচ্চতার মানুষের চেয়ে তাঁর কাপড়ের প্রয়োজন হতো বেশি। একদিন খলিফা হজরত উমর (রা.) একটি নতুন জামা পরে মসজিদে আসেন। তিনি সালাতে ইমামতি করার জন্যে যখন মেহরাবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একজন সাধারণ আরব তাঁকে প্রশ্ন করলো যে, জামা তৈরি করার অতিরিক্ত কাপড় তিনি কোথায় পেয়েছেন (উলে- খ্য বায়তুলমাল থেকে খলিফাসহ সকলকে সমপরিমাণ কাপড় বরাদ্দ দেয়া হয়েছিলো)। খলিফা উমর (রা.) বললেন, 'আমার পুত্র আব্দুল- াহ এর জবাব দেবে'। খলিফা পুত্র আব্দুল- াহ তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বললেন যে, তিনি এবং তাঁর পিতা উমর (রা.) উভয়েই অন্যান্য সকলের সমপরিমাণ কাপড়ই পেয়েছেন কিন্তু তিনি তাঁর পিতার জামা তৈরি করার জন্য অতিরিক্ত কাপড়ের প্রয়োজন হয় বলে নিজ অংশ পিতাকে দিয়েছেন। খলিফা নিজের জন্যে অতিরিক্ত কাপড় নেন নি—এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে জামাতে উপস্থিত সকলে সন্তুষ্ট হলেন এবং হজরত উমর (রা.)কে সালাতে ইমামতি করার অনুমতি দিলেন।

শূন্যতাপন্থি বস্তুবাদের কোনো বাহ্য নৈতিকতা নেই এবং শক্তি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে অন্য সকল শ্রেণীকে উচ্ছেদ করে এক বিশেষ শ্রেণী তথা সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই এ বস্তুবাদ তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। কিন্তু চৌদ্দশ' বছর আগে কলেমার অনুসারীরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, মানবসৃষ্ট কোনো মতবাদই তার চেয়ে উত্তম বা তার অনুরূপ কোনো দৃষ্টান্ত আজো স্থাপন করতে পারে নি। সেসময় শিল্প ও শ্রম কেন্দ্রীভূতকরণ সম্পূর্ণ অজানা ছিলো, উৎপাদন যন্ত্রের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা শোষণের প্রধান হাতিয়ার ছিলো না এবং মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন মেটানোর জন্যে যথেষ্ট স্থান ও উপকরণ বিদ্যমান ছিলো।

ব্যক্তিগত দখলদারি

মালিকানা বলতে কোনো জিনিসকে দখল করা, ভোগ করা এবং হস্তান্তরিত করার অবাধ অধিকার বুঝায়। বিশ্বের যাবতীয় সম্পদের ওপর আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মালিকানার নীতি সম্পদ ও সম্পদ উৎপাদন যন্ত্রের ওপর মানুষের অবাধ অধিকারকে অস্বীকার করে। ব্যক্তিগত দখলদারিত্ব যাতে সমাজ ও মানবতাবিরোধী না হয় সে জন্যে সম্পদের ওপর আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মালিকানার স্বীকৃতি দ্বারা ধনসম্পদের ওপর ব্যক্তিগত ও সামাজিক দখল করার দাবিকে সংযত করা হয়েছে। কলেমার অর্থনীতি অনুসারে সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত দখলের অধিকার নির্ভর করে সমাজের ইচ্ছার ওপর। তাই সাধারণ জনগণের স্বার্থরক্ষা এবং তাদের জীবনমান উন্নত করা তথা সব লোকের মধ্যে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের জন্যে সমাজ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আরোপিত শর্তের দ্বারা ব্যক্তিগত দখলদারিত্ব বা অধিকার নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনো সমাজ বা জাতি ততোক্ষণ পর্যন্তই সামাজিক বা জাতীয় সম্পদ সমষ্টিগতভাবে দখলে রাখার অধিকার ভোগ করে, যতোক্ষণ সেটা সমগ্র মানবজাতির সুখশান্তি এবং মানুষের বিশ্ব-নাগরিকত্ব লাভের অধিকারকে খর্ব না করে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর উদ্বৃত্ত খালি জমি আছে অথচ আমাদের মতো একটা ঘনবসতিপূর্ণ দেশে মানুষের মাথাগোঁজার জন্যে যতোটুকু জমি প্রয়োজন ততোটুকুও নেই। আমেরিকাবাসী বা অস্ট্রেলিয়াবাসীরা অন্যান্য দেশের ক্ষুধার্ত মানুষকে ব্যাপক হারে তাদের দেশে প্রবেশের সুযোগ দেয় না বা নিজেদের দেশের নাগরিকত্ব দেয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষ ক্ষুধায় কাতর থাকলেও তারা তাদের উদ্বৃত্ত জমিতে ফসল না ফলিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সে জমিকে সংরক্ষিত রাখে। কিন্তু এর চেয়েও নিষ্ঠুর ও অমানবিক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশে লাখ লাখ মানুষ যখন ক্ষুধা, রোগব্যাধি ও মহামারিতে প্রাণ হারায় তখনও তারা তাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় লাভের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে নিজেদের উদ্বৃত্ত খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করে বা আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়িয়ে ফেলে। এ ধরনের অন্যায় ও মানবতাবিরোধী ব্যক্তিগত বা যৌথ দখলের অধিকারকে কলেমার অর্থনীতি একেবারেই স্বীকার করে না।

ছোট বড় সকল জীবেরই পুষ্টি ও অস্তিত্বের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন। সুন্দরবনের বাঘের খাবার হচ্ছে হরিণ। তাই বাঘের অস্তিত্বের জন্য ততোটুকু জায়গার প্রয়োজন যতোটুকু জায়গার মধ্যে বাঘের খাবার হরিণ বেঁচে থেকে বংশবিস্তার করতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। তবে মানুষের বেলায় উৎপাদন যন্ত্রের উন্নতি ও জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই জায়গার অনুপাত একটু একটু করে কমে আসে। তবু সব সময়ই মানুষের জীবনধারণের জন্যে মাথাপিছু একটা নির্দিষ্ট 'স্থান অনুপাত' (প্রাপ্ত স্থান ও জনসংখ্যার মধ্যকার অনুপাত) থাকে। যখন প্রাপ্ত স্থান ও জনসংখ্যার অনুপাত নির্দিষ্ট 'স্থান-অনুপাত' এর নিচে নেমে যায় তখন ভূমি এই অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে নিজ বুক থেকে তাড়িয়ে দেয় বা উপড়ে ফেলে। এভাবে তাড়িয়ে দেয়া বাড়তি জনসংখ্যা যদি অন্য কোনো দেশে বসবাসের জন্যে স্থান পায় তাহলে তারা বেঁচে যায়। পক্ষান্তরে তাড়িয়ে দেয়া জনগোষ্ঠীকে যদি ভিন্ন দেশ স্থান না দিয়ে পুনরায় তার নিজ দেশের মাটিতে, ফেরত পাঠায় তাহলে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ স্বাধীন ও শক্তিশালী দেশের ক্ষেত্রে দেখা দেয় যুদ্ধ আর অনুন্নত জাতিদের ক্ষেত্রে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ ও মহামারি। স্থান ও জনসংখ্যার এই নিয়মের সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে জার্মানির যুদ্ধ এবং বিভাগ পূর্ব বাংলার দুর্ভিক্ষ। সুতরাং এর থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, বিশ্ব-শান্তির সকল আলোচনাই ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হবে এবং যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা মহামারি কোনো কিছুরই অবসান হবে না, যদি না পৃথিবীর উদ্বৃত্ত সমস্ত জায়গাকে অভাবগ্রস্ত নিঃস্ব লোকজনের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

কলেমার শিক্ষার অন্যতম নীতি হচ্ছে, সম্পদ ও উৎপাদন যন্ত্রের ওপর ব্যক্তিগত ও জাতিগত অধিকারের দাবিকে সীমিত করা, আর তা-ই হচ্ছে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পিতৃত্বসুলভ প্রভুত্ব ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব তত্ত্বের অন্যতম কথা। এ নীতিকে ইসলামি রাষ্ট্রের খলিফাগণ তাঁদের বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে সঠিকভাবে অনুসরণ করতেন। তাঁরা যুদ্ধ করতেন কিন্তু অন্য জাতির সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার কথা চিন্তাও করতেন না। এমনকি শুধুমাত্র নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যেও তারা অন্যজাতির জীবন, স্বাস্থ্য বা সুখশান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাদের সম্পদ ব্যবহার করেন নি। মানুষের বিশ্বনাগরিকত্বের নীতির প্রতি তাঁরা এতোটাই বিশ্বস্ত ছিলেন যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যেই খিলাফতের দরজা উন্মুক্ত রেখেছিলেন। কলেমার শিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে খিলাফতকালীন সময়ের আরববাসী শুধু নিজেরা বেঁচে থেকে অন্যকে বাঁচতে দিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন না বরং তাঁরা কোনো কোনো সময় অন্যকে বাঁচানোর জন্য নিজেরা সানন্দে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতেন।

সম্পদের মজুতদারি

প্রকৃতির অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং কলেমার শিক্ষা—'প্রত্যেকের পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহের অধিকার'-এর সঙ্গে সম্পদের মজুতদারি সামঞ্জস্যহীন। পবিত্র কুরআনে

মজুতদারকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে এবং মজুতদারির অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় হুশিয়ারি করে বলা হয়েছে—**'তারা অভিশপ্ত যে অর্থ সঞ্চিত করে এবং ইহা বারবার গণনা করে; সে ধারণা করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সঙ্গে থাকবে; কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামা নামক দোজখে' (১০৪:২-৫)**। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলো দামেস্ক ও বাগদাদের মুসলমান পুরোহিতদের তথা মোল- াদের বিচলিত করে তুলেছিলো। কেননা, তারা সুলতানের কাছে তাদের বিবেক ও র"চিকে বিক্রি করে ফেলেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে যেভাবে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা জনসাধারণকে শোষণ করার জন্যে শোষকদের কাছে তাদের প্রতিভা বিক্রি করতে দ্বিধাবোধ করেন না। এসব অসৎ মোল- ারা এই আয়াতগুলোর আসল অর্থ ও তাৎপর্যকে বিকৃত করলো। তারা এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করলো যে, সম্পদ মজুত করা বলতে জাকাত এবং অন্যান্য কর পরিশোধ না করে মজুত করা বুঝায়। এভাবেই তারা মূলত ইসলামবিরোধী সাম্রাজ্য ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে তৎকালীন দামেস্ক ও বাগদাদের খলিফাদের সাহায্য করলো।

বর্তমানের আরাম আয়েশ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সংকটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ইচ্ছা থেকেই মানুষ সম্পদ মজুত করার প্রেরণা লাভ করে। সঞ্চয়ের এই মূল কারণের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পবিত্র কুরআনে সুরা আল ইমরানের ১৮০ আয়াতসহ আরো বিভিন্ন স্থানে তাই বলা হয়েছে যে, সঞ্চিত সম্পদ মানুষের জীবনের সুখশান্ড়ি নিশ্চিত করতে পারে না, বরং তা মানুষকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। উপরে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের এই আয়াত দ্বারা হজরত মুহম্মদ (সা.) এর একজন বিখ্যাত ও সম্মানিত সাহাবি (সহচর) হজরত আবু জর (রা.) এতোই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, তিনি সম্পদ মজুদ করার বির"দ্ধে প্রচারণা চালানোকে তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রায়ই রাস্ড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে পথচারীদের জিজ্ঞেস করতেন, তার সম্পদের পরিমাণ কতো এবং সম্পদের পরিমাণ জানার পর তিনি পথচারীকে পরবর্তী তিনবেলা আহারের জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে উদ্বৃত্ত যা কিছু থাকে তার সবটুকু সমাজের ব্যবহারের জন্যে বায়তুলমালে দান করে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করতেন। এজন্যেই সোভিয়েত রাশিয়ার মুসলিম বসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে বর্তমানে (১৯৫০ খ্রি.) হজরত আবু জর (রা.) এর জীবনীগ্রন্থ র"শ ভাষায় অনুবাদ করে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। উপরে উলে- খিত পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি ইসলামি অর্থনীতির মূল আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে এবং এ কারণে সমাজ ও মানবতাবিরোধী সম্পদের সঞ্চয়কে কঠোরভাবে নিন্দা করে। তবে অপরের মঙ্গল তথা সমৃদ্ধির প্রতি বাধা স্বরূপ নয় এরূপ পরিমাণ ধনসঞ্চয়ের প্রতি পবিত্র কুরআনে কোনো নিষেধ আরোপ করে না।

হজরত মুহম্মদ (সা.) এর জীবনে এই আদর্শের বাস্ড়ব রূপায়ন লক্ষ্য করা যায়। একদিন রাসুল (সা.) নামাজের জামাতে ইমামতি করা অবস্থায় হঠাৎ থেমে গেলেন এবং নামাজ ত্যাগ করে মসজিদ সংলগ্ন নিজ বাসগৃহে প্রবেশ করলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি

ফিরে এসে পুনরায় নামাজ শুর" করলেন। এটা ছিলো অস্বাভাবিক ঘটনা, যা সচরাচর ঘটে না। নামাজ শেষে রাসুল (সা.) এ ঘটনার ব্যাখ্যাদান করতে গিয়ে বললেন যে, নামাজরত অবস্থায় তাঁর (সা.) মনে পড়ল যে, ঘরে একটি অব্যয়িত 'দিরহাম' রয়ে গেছে এবং সঞ্চিত সম্পদের বা অর্থের অধিকারী হয়ে নামাজ পড়লে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে পয়গম্বরের নামাজ গ্রহণযোগ্য নয় বলেই তিনি 'দিরহামটি' অন্য একজন অভাবগ্রস্ড় লোককে দান করার জন্যে নামাজ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। খিলাফতের কার্যনির্বাহ করার সময় খুলাফায়ে রাশেদিনগণ হজরত মুহম্মদ (সা.)কে অত্যন্ড় নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতেন। খলিফা উমর (রা.) মসজিদের মধ্যে একজন ইহুদি কর্তৃক নিহত হন ও শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যু যখন আসন্ন তখন তিনি তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহচরকে ডেকে অনুরোধ করলেন, খিলাফতের কোষাগারে যদি কোনো সঞ্চিত সম্পদ থেকে থাকে তবে তা যেন কোনো প্রয়োজনীয় কাজে তাড়াতাড়ি ব্যয় করা হয় কেননা মজুত করা সামাজিক সম্পদ রেখে তিনি আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে যেতে চান না।

মূলধন, সুদ ও মুনাফা

বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের অর্থনীতি অনুযায়ী সঞ্চিত সম্পদ যখন মূল্য ও উপযোগ (utility) উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে মূলধন বলে। তাই এটি উৎপাদনের চারটি এজেন্টের অন্যতম বলে স্বীকৃত। আর সুদ হচ্ছে জাতীয় আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে মূলধনের অংশ। সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের অন্য তিনটি এজেন্ট যথা-ভূমি, শ্রম ও সংগঠনেরও নিজ নিজ অংশ আছে। ভূমি পায় খাজনা, শ্রমিক পায় মজুরি আর সংগঠন পায় মুনাফা। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, বাস্ড়ব ক্ষেত্রে বৃহৎ মূলধন ক্ষুদ্র মূলধনকে আত্মসাৎ করে এবং বৃহৎ সংগঠন ক্ষুদ্র সংগঠনকে আত্মসাৎ করে। এর ফলে পৃথিবীর যাবতীয় বস্ড়ুগত সম্পদ অল্প সংখ্যক লোকের দখলে এসে পড়ে। বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার নামে এই অল্প সংখ্যক লোকই সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন এবং ব্যবহারের সমগ্র ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এ অবস্থায় লক্ষ লক্ষ অসংগঠিত মানুষ কীভাবে মুষ্টিমেয় সংগঠিত পুঁজিবাদী ব্যক্তি দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে শোষিত হয় তা বুঝার জন্যে বিশেষ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। ধনতন্ত্র শ্রমের মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। শ্রম এখন ক্রয়যোগ্য জিনিস আর পুঁজিপতিরা এর একমাত্র ভোক্তা বা ক্রেতা। শ্রমের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থাকায় পুঁজিপতিরা নিজেদের ইচ্ছামতো শ্রমিকের মজুরি ও শ্রমের অন্যান্য শর্তাবলী নির্ধারণ করে। ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প যতোই উন্নতি লাভ করে, ততোই এগুলো কেন্দ্রীভূত হয়। এর ফলে শ্রমিকেরা একটু একটু করে কেন্দ্রীভূত হয়ে সুসংগঠিত হয়। অতঃপর সংগঠিত মূলধন এবং সংগঠিত শ্রম তথা শ্রমিক মুখোমুখি প্রতিযোগিতার সম্মুখিন হয়

এবং সুবিচার, ন্যায়নীতি ও পরিচ্ছন্ন ব্যবসায়ের নামে কে কাকে শোষণ করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চালায়।

পৃথিবীর সব ধর্ম ব্যবস্থা বর্তমানে যে অবস্থায় বিরাজ করছে, তাতে করে তারা প্রত্যেকে আধুনিক সভ্য জগতের নীতিতত্ত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে তালমিলিয়ে শ্রমিকদিগকে শোষণ করার কাজে পুঁজিপতিদের নির্লজ্জভাবে সমর্থন করে। এ রকম অসৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ধর্ম, নীতিতত্ত্ব, ন্যায়পরায়ণতার অস্বীকৃতি, শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিসংগ্রাম এবং ধ্বংসাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণীকে নির্মূল করে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা অনিবার্য। সর্বহারাদের নিরশ্বরবাদী বস্তুতান্ত্রিক দর্শন তাদের নিজেদের সৃষ্ট নয়। এটা হচ্ছে পুঁজিপতিদের বস্তুবাদী জীবনদর্শন ও তাদের যন্ত্র সভ্যতারই ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফল। যে পর্যন্ত না শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় বিকাশপ্রাপ্ত যন্ত্র সভ্যতার এই অমানবিক ও পাশব বস্তুবাদের ভিত্তিমূলকে টলিয়ে দেয়া যায়, সে পর্যন্ত পৃথিবীতে যথার্থ শান্তি ও সমৃদ্ধি আসতেই পারে না। বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ এবং ধনতন্ত্রের পরিবর্তে সর্বহারাদের সাম্রাজ্যবাদ ও কেন্দ্রীভূত ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে পৃথিবীর মানুষের কোনো উপকারতো হবেই না, বরং তারা আরো শৃঙ্খলিত হবে। বুর্জোয়াদের ধনতন্ত্রের মূল হচ্ছে জড়বাদ আর সর্বহারা সমাজতন্ত্রের শূন্যতাপন্থি বস্তুবাদ হচ্ছে তারই ফল। যে পর্যন্ত মূল থাকবে সে পর্যন্ত ফল থাকবেই। সে জন্যে আসল প্রয়োজন হচ্ছে বিশ্বের যাবতীয় দুঃখকষ্টের মূল-কে ধ্বংস করা। মানুষের সকল দুঃখকষ্টের মূল হচ্ছে বুর্জোয়াদের মানসিকতা ও বুর্জোয়াদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বস্তুবাদী সমাজব্যবস্থা। আর এর ধ্বংসই বিশ্বের সব দুঃখদুর্দশার অবসান ঘটাতে পারবে। কেননা মূল যদি নষ্ট করা হয় তাহলে ফলের আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। পবিত্র আল কুরআন ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দিয়ে এবং সুদকে হারাম করে দিয়ে এই মূলকে-ই উচ্ছেদ করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'যারা সুদ খায় তারা কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। ইহা এজন্যে যে, তারা বলে: 'ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদের মতো'। অথচ আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন ও সুদকে হারাম করেছেন। অতঃপর যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই। তার ব্যাপার আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ওপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই অগ্নি অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে' (২:২৭৫)।**

এখানেও আবার তথাকথিত মোল- ারা ধনতন্ত্রকে সমর্থন করার জন্যে এগিয়ে আসেন। তারা সুদের আরবি প্রতিশব্দ 'রিবা' এর একটা চতুর ব্যাখ্যা দিয়ে পবিত্র কুরআনের বক্তব্যকে হালকা করতে চান। তারা বলেন, 'রিবা'র অর্থ সুদ নয় চোটা অর্থাৎ পীড়নমূলক সুদ। কিন্তু ব্যাখ্যা করার সময় তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যান যে, সুদ এবং পীড়নমূলক উচ্চহারের সুদের মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য যেটুকু আছে, সেটা পরিমাণগত। পবিত্র কুরআনের আধুনিক ভাষ্যকারগণ সমসাময়িক বিশ্ব ব্যবস্থার

পরিপ্রেক্ষিতে আশংকা করেন যে, ব্যবসাবাণিজ্যে একটা যুক্তিসঙ্গত সুদের ব্যবস্থা না-রাখলে ব্যবসাবাণিজ্য অচল হয়ে পড়বে এবং বিশ্বের গোটা অর্থনৈতিক কাঠামোই ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু এই আশংকার বিজ্ঞানসম্মত কোনো ভিত্তি নেই। সুদহীন কেন্দ্রীয় সামাজিক ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য যে শুধু চালু রাখা যায় তা নয়, অধিকন্তু অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে এগুলোর পরিচালনা করে সমাজের সত্যিকার কাজে লাগানো যায়। সুদকে হারাম করে দিয়ে পবিত্র কুরআন জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে মূলধনের লভ্যাংশকে অস্বীকার করেছে। তাই পবিত্র কুরআনের অর্থনীতি অনুযায়ী মূলধন, উৎপাদনের স্বাধীন এজেন্ট হিসেবে বিবেচিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হচ্ছে মূলধন ও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ বা বিলুপ্তি সাধন।

সমাজব্যবস্থার রূপ ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক যা-ই হোক, টাকাপয়সা বা জিনিসপত্রের ব্যক্তিগত লেনদেন একটি সামাজিক প্রয়োজন; সে প্রয়োজন অল্পই হোক বা বেশিই হোক। এই বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা না-করে পবিত্র কুরআন প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে লেনদেনের একটা উৎকৃষ্ট নিয়ম নির্দেশ করেছে। সুদমুক্ত এবং যখন সামর্থ হবে তখন ফেরত দেয়া যাবে এই শর্তে ঋণ গ্রহণ পবিত্র কুরআনে জায়েজ করা হয়েছে এবং এ ধরনের ঋণকে 'কর্জে হাসানা' বা 'সুন্দর ঋণ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের ঋণ দেয়া পুণ্যের কাজ। কারণ অভাবগ্রস্ত ভাইবোনকে সাহায্য করার একটা অকৃত্রিম ও আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ থেকে এর উৎপত্তি। তাছাড়া এটা প্রতিবেশির দুঃখদুর্দশার সুযোগ নিয়ে দর-কষাকষি করার প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত। পবিত্র কুরআন 'আল- াহকে ঋণ দেয়া' অর্থে এ ধরনের ঋণ তুলনা করেছে। বলা হয়েছে—**'কে সে, যে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে করযে হাসানা প্রদান করবে? অতঃপর তার জন্য ইহা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই সংকুচিত করেন ও প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে' (২ : ২৪৫)।**

ব্যবসায় বাণিজ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসায় করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু' (৪:২৯)।** এভাবে ইসলাম ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্যে এক চমৎকার নীতিতত্ত্ব প্রদান করে, যা ব্যক্তিগত ও যৌথ ব্যবসায় বাণিজ্য করার প্রেরণাকে ধ্বংস না-করে তাকে কল্যাণকর করে তোলে। মজুতদারিকে শর্তহীনভাবে বর্জন করার মাধ্যমে সম্পদের অবাধ চলাচল নিশ্চিত করা হয়। আর অধিক লাভের আশায় ভোগপণ্য, বিশেষত খাদ্যদ্রব্য ও জীবন ধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য ভোক্তাকে ব্যবহার করতে না দিয়ে মজুতদারির মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের পথ বন্ধ করা হয়। ইসলামি ব্যবস্থার অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো ঋণ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে একই ধরনের আচরণবিধি নির্দেশ

করা হয়েছে। সুতরাং এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির যে রকম ব্যবহার আশা করা যায়, এক জাতিরও অন্য জাতির সঙ্গে সেই একইরূপ ব্যবহার করা অবশ্য কর্তব্য।

জাকাত ও উত্তরাধিকার আইন

বাগদাদ, দিলি- ও আগ্রার সাম্রাজ্যবাদী সুলতান এবং স্বার্থান্বেষী ধর্মতত্ত্ববিদদের মতো যারা সম্পদের ইসলাম বিরোধী সঞ্চয় এবং ব্যবহারের পক্ষে ধর্মগ্রন্থের দোহাই দেন, তারা যুক্তি দেখান যে, জাকাত ও উত্তরাধিকার আইন সম্পদ সঞ্চয়ের অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। আসলে একথা বলে তারা নিজেদের ধোঁকা দিচ্ছে, যদিও আসল কথা একেবারে ভিন্ন। জাকাত ও উত্তরাধিকার আইন অযোগ্য ও অলস উত্তরাধিকারীদের ভরণপোষণ ও বিলাসিতার জন্যে রাশি রাশি সম্পদ সঞ্চয় করে যাওয়া কারো জন্যে বাধ্যতামূলক করে নি। এসব আইন সম্পদ সঞ্চয় করাকে উৎসাহিত করে না বরং এ আইনগুলো হচ্ছে সম্পদ বিভক্তকরণের পদ্ধতি। সুতরাং এ আইনগুলো মজুতদারির বির"দ্ধে অত্যন্ড় কার্যকরী ব্যবস্থা। অন্যের আর্থিক ক্ষতি সাধন না-করে সামাজিক ব্যবস্থা যতোদিন মানুষকে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের অধিকার দেবে ততোদিন পর্যন্ড় জাকাত ও উত্তরাধিকারী আইন সম্পদ বিভক্তির শক্তি হিসেবে কার্যকর থাকবে।

জাকাত আয়ের ওপর কর নয় বরং এটি হচ্ছে সম্পত্তির ওপর কর। লাভ ক্ষতি যা-ই হোক বছর শেষে অভাবগ্রস্ড়দের অভাব পূরণের জন্যে নিজের সম্পদ থেকে একটা নির্ধারিত অংশ সমাজের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। বৃদ্ধ, পীড়িত, শিশু প্রভৃতি যারা নিজেরা পরিশ্রম করে জীবিকানির্বাহ করতে পারে না, এরূপ অভাবগ্রস্ড়দের ভরণপোষণের জন্যে ব্যক্তির বাধ্যতামূলক নিৃতম দান, যা সমাজের নিকট প্রদান করতে হয়, তা-ই হচ্ছে জাকাত। অপরদিকে উত্তরাধিকার আইন মৃত মুসলমান ব্যক্তির সম্পত্তি তার বহুসংখ্যক উত্তরাধিকারীর মধ্যে ভাগ করে দেয় এবং এভাবে একজন মুসলমানের জীবিত অবস্থায় তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করার পর যে সম্পদটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটুকুও বিভিন্ন শরিকের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া মৃতের সম্পদ শুধু উত্তরাধিকারীদের মধ্যেই বণ্টন করা হয় না, অন্যেরাও এর ওপর অধিকার রাখে। এমনকি দুস্থ ও অভাবগ্রস্ড়দের জন্য প্রয়োজন দেখা দিলে সমাজও এ সম্পদের একটা অংশ পেতে পারে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'সম্পত্তি বণ্টনকালে যখন আত্মীয়, এতিম এবং অভাবগ্রস্ড় উপস্থিত হয় ইহা থেকে তাদেরকে কিছু দাও এবং তাদের সঙ্গে কিছু সদালাপ করো' (৪:৮)**।

সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বিতরণের এই নীতি ও পদ্ধতি এতো বাস্ড়ব ও কার্যকরী যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইসলামের নীতিগুলোর মধ্যে অনেক ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটানোর পরও মুসলিম সমাজগুলোয় এগুলোর প্রভাব এখনও দেখা যায়। বিশ্বের প্রায় সব জায়গাতেই মুসলমানেরা পশ্চাৎপদ এবং বলতে গেলে সর্বত্রই সর্বহারা। অনেকেই বলেন, বিশ্বব্যাপী তাদের এই আর্থিক সংকটের কারণ হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাহীনতা। কিন্ড়ু কথাটি সঠিক নয়। কারণ বহু শতাব্দী ধরে ইহুদিদের রাজনৈতিক মর্যাদা,

সম্মিলিত রাজনৈতিক অস্ড়িত্ব এমনকি আবাসভূমি পর্যন্ড় না-থাকা সত্ত্বেও তাদের দ্বারাই বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই বলা যায়, ইসলামের সম্পদ বিকেন্দ্রিকরণের নীতি ও পদ্ধতির প্রতি মুসলমানদের উদাসীনতা প্রদর্শনই হচ্ছে তাদের আর্থিক পশ্চাৎপদতার মূল কারণ।

কলেমার অর্থব্যবস্থার ভিত্তি কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ থেকে প্রসূত নয়। তাছাড়া মানুষের জীবনে একে কার্যকরী করার জন্য কোনো ধরনের বল প্রয়োগেরও প্রয়োজন হয় না। কেননা প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সঙ্গে এ ব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শ্রেণী ও ব্যক্তি নির্বেশেষে সকলের জন্য মঙ্গলজনক। তাই, অন্যান্য সকল শ্রেণীকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে কোনো বিশেষ শ্রেণীর একনায়কত্বের ধারণা এতে নেই। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সম্পদের সমাজবিরোধী ও মানবতা বিরোধী ব্যবহার ও সঞ্চয় কিংবা ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধি অস্বাভাবিক, আর এজন্যেই এগুলো মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থি ও ধ্বংসের কারণ। জীবনযাত্রার প্রাচুর্য এবং অমিতব্যয়িতার নিন্দা করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—**'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে যতোক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও' (১০২: ১-২)**। বিভিন্ন জাতির পতনের কারণ বিশে- ষণ করলেই এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পারস্য রাজদরবারের বিখ্যাত গালিচা যখন মহান খলিফা উমরের (রা.) সামনে উপস্থিত করা হয়েছিলো তখন তিনি শিশুর মতো কেঁদে ওঠে আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন—'এই গালিচার মধ্যে আমি আমার জাতির ধ্বংস ও মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি'। চরম প্রাচুর্য ও বিলাসিতায় মগ্ন থাকা অবস্থায় সারাবিশ্ব জুড়ে মুসলমানদের পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মহান খলিফার এই আশংকার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। বস্ড়ুগত সম্পদের প্রাচুর্য এবং অমিতব্যয়ী জীবনযাত্রা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো মানুষের জীবনীশক্তির ক্ষয় সাধন করে এবং পরিশেষে তার মৃত্যু ঘটায়। এই প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞ ও অসচেতন মানুষ নিজের তাৎক্ষণিক আরাম আয়েশের জন্যে এবং ভবিষ্যৎজীবনে নিরাপত্তার জন্যে জাহান্নামের (নরক) পথ প্রশস্ড় করে। প্রাচুর্যের এই মর্মান্ড়িক পরিণতি এবং জীবনে ভারসাম্য রক্ষার সুফল সম্বন্ধে আল কুরআন তাই মানুষকে যথার্থই সচেতন করে দিয়েছে।

ব্যক্তি মানুষ হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদি কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা শ্রেণী নিজেদের বিলাসিতা কিংবা অস্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির জন্যে নির্বোধের মতো অন্য সকলের রক্ত শোষণ করে তাহলে সামগ্রিক জীবনকে প্রকৃতিবির"দ্ধভাবে অস্বাভাবিক করে তোলার কারণে তারা নিজেরাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দেহের এক অংশকে ক্ষুধার্ত রেখে অন্যান্য অংশের পুষ্টি সাধন সম্ভব নয় কেননা জীবের সুস্থ ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্যে দেহের সব অংশের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ অপরিহার্য। অনুরূপভাবে দেহের অন্যান্য অংশ বাদ দিয়ে কোনো বিশেষ অংশের অস্বাভাবিক উন্নতি সমগ্র দেহের স্বাভাবিক উন্নতিকে ব্যাহত করে এবং পরিশেষে তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি ও শ্রেণীর স্বার্থে শোষণ বন্ধ করতে হবে এবং একই সঙ্গে যে সমাজব্যবস্থা সম্পদের

অন্যায় ও অসঙ্গত বিতরণ ও ব্যবহারকে উৎসাহ দান করে সে সমাজ ব্যবস্থারও অবসান ঘটাতে হবে।

সম্পদের ওপর মানুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠা, মজুতদারি এবং অনিয়ন্ত্রিত অধিকারের কুফল এবং সম্পদের সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত বিতরণের সুফল সম্পর্কে কলেমা আরববাসীকে সাফল্যের সঙ্গে সচেতন করে তুলেছিলো বলে শক্তি প্রয়োগ বা জুলুম ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে মদিনায় এক সমাজতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, কলেমার অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থা বিশেষ কোনো শ্রেণীর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ এবং অন্যান্য শ্রেণীর জন্য অভিশাপস্বরূপ নয়। বরং কলেমা সমগ্র মানবজাতির জন্য এবং একই সঙ্গে সমগ্র জীবজগতের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। এই চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই সে সময়কার আরববাসী নিজেদের প্রয়োজন পূরণের তৃপ্তির চেয়ে অন্যের প্রয়োজন মেটানোর তৃপ্তির মধ্যে অধিকতর আনন্দবোধ করতেন; এমনকি একটি কুকুরকে অভুক্ত রেখে কোনো আরব নিজে পেটভরে আহার করতেন না। এটাই হলো কলেমার অলৌকিকত্ব। নিজের পরিশ্রমের ফল নিজে ভোগ করার অধিকার মানুষের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে স্বাভাবিক ও প্রধান প্রেরণা। মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে কলেমা পূর্ণ স্বীকৃতি দান করে। আর তাই মানুষের প্রতিভা বিকাশের জন্যে যতোটুকু প্রয়োজন ততোটুকু ব্যক্তি অধিকারকে সে খর্ব করে না কিন্তু সম্পদ দখলের ব্যক্তিগত অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে কাজ করার ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার প্রেরণা গুটিকতেক লোকের মধ্যে না-থেকে সকলের মধ্যে সমানভাবে সজীব থাকে। তাই কলেমার অর্থনীতি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে সে পর্যন্তই সমর্থন দান করে যে পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টা সাধারণ জনগণের স্বার্থের পরিপন্থি না-হয়ে পরিপূরক হয়। কলেমার শিক্ষা সম্পদের সঞ্চয়কে নিন্দা জানায় এবং বস্তুগত সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বিতরণ ও ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব পদ্ধতি নির্দেশ করে। কলেমার আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে নৈরাজ্য বা অরাজকতা প্রতিষ্ঠাই মানব প্রগতির শেষ ধাপ বলা চলে না বরং এটা হলো মানুষের সত্যিকারের উন্নতি ও প্রগতির প্রথম ধাপ। সুতরাং কলেমার সমাজতন্ত্র হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, জোরজুলুম বা কোনো বিশেষ শ্রেণীর একনায়কত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, মানুষের আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নয়নের সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রকৃতির অর্থ ব্যবহারনীতি থেকে অর্জিত জীবন সংরক্ষণ ও জীবনের ক্রমোন্নতির জ্ঞানই হচ্ছে এর ভিত্তি।

অষ্টম অধ্যায়

সাংস্কৃতিক বিপ- ব

কলেমার সংস্কৃতি

মানুষের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ কর্মশক্তিগুলোর বিকাশ এবং তার আচরণ ও বর্তমান বস্তুগত পরিবেশের মধ্যে তার বহিঃপ্রকাশের নাম হচ্ছে সংস্কৃতি। সুতরাং কোনো সংস্কৃতির পরিচয় সে সমাজের লোকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং প্রকৃত জীবনব্যবস্থার মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। কলেমার সাংস্কৃতিক বিপ- বকে দেখতে পাওয়া যায় মদিনার প্রাথমিক মুসলিম আরব সমাজের মধ্যে। প্রাচ্য-সংস্কৃতির বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও লেখকগণ দামেস্ক, বাগদাদ, আলেকজান্দ্রিয়া ও কর্ডোভা সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি; সাম্রাজ্যবাদী আরব ও তুর্কিদের সংস্কৃতি এবং দিলি- -আগ্রার মুঘলদের সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামি সংস্কৃতিকে জড়িয়ে ফেলে একটা সাধারণ ভুল করেছেন। এসব সংস্কৃতির ওপর বহুদিন পূর্বে পরিত্যক্ত ইসলামি সংস্কৃতির সামান্য ছাপ আছে মাত্র, তবে এগুলো হজরত মুহম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবিদের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বতো করেই না বরং তার মধ্যে এসব সংস্কৃতির বিকৃতরূপই পরিলক্ষিত হয় বেশি। এ জন্যে এমন সংস্কৃতিকে মুসলিম সংস্কৃতি বা ইসলামি সংস্কৃতি বলে কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।

আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি

প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা যখন ইরান, মিশর এবং সমগ্র আরব ভূখণ্ডের শাসনকর্তা ছিলেন তখনো মুসলমানদের জীবনপদ্ধতি এতোই সহজ ও সরল ছিলো যে তা দেখে অনেকে মনে করতেন যে, ইসলাম আসলে দারিদ্র্যের দর্শন ও সংস্কৃতি। তবে এমন ধারণা পোষণকারীরা আসলে ইসলামের মর্মবাণীর সঙ্গে পরিচিত হতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কলেমার দর্শন ও সংস্কৃতি দারিদ্র্যের দর্শন ও সংস্কৃতি নয় বরং এটা হচ্ছে বস্তুগত ঐশ্বর্যের দারিদ্র্যের দর্শন ও সংস্কৃতি। কলেমার শিক্ষা মানুষের বস্তুগত সম্পদের প্রয়োজনীয়তাকে হেয় জ্ঞান করে না বা হ্রাস করতে চায় না বরং মানুষের বস্তুগত সমস্যার সমাধান ও বস্তুগত প্রয়োজনের পরিতৃপ্তির ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। হজরত মুহম্মদ (সা.) বলেছেন—**'দারিদ্র্য মানুষকে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে'**। কিন্তু তা সত্ত্বেও কলেমা বস্তুগত সম্পদের যা প্রাপ্য তার থেকে বেশি গুরুত্ব তার ওপর আরোপ করে না এবং মানুষকে তার জড় পরিবেশের দাসে পরিণত করে না।

মানুষকে, সৃষ্টির বস্তুগত সম্পদের দাস হিসেবে নয় বরং প্রভু হিসেবে তৈরি করা হয়েছে এবং তাকে তার বস্তুগত পরিবেশের স্রষ্টার মর্যাদা দেয়া হয়েছে। মানুষ যখন তার বস্তুগত জীবনব্যবস্থার প্রভাবের দ্বারা পরাভূত হয় তখন ধীরে ধীরে সে পরিণত হয় তার বস্তুগত পরিবেশের সৃষ্ট দাসে। অপরদিকে, সে যখন তার বস্তুগত সম্পদ ও আরাম আয়েশের প্রভাবকে পরাভূত করতে পারে তখনই সে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে বস্তুগত পরিবেশের সত্যিকারের 'প্রভু' হিসেবে এবং প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্টি করে নিজের পরিবেশ। এজন্যেই কলেমা মানুষের মানবিক গুণের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং বস্তুগত সম্পদ ও আরাম আয়েশকে ততোক্ষণই ব্যবহার করে যতোক্ষণ তাদের প্রয়োজন থাকে। তবে বিলাসিতা ও প্রাচুর্যকে কলেমা মোটেও প্রশ্রয় দেয় না কেননা মানুষের অভ্যাস ও চরিত্রের ওপর এগুলো প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। মদিনার আদর্শ মুসলিম সমাজে মানুষের মহত্ব তার বস্তুগত পরিবেশের জাঁকজমকের চেয়েও স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হতো কিন্তু তথাকথিত উন্নত ও সভ্য সমাজে মানুষ তার জড়পরিবেশের জাঁকজমকের ঔজ্জ্বল্যের কাছে ম্- ান হয়ে গেছে। তাছাড়া কলেমা সমগ্র মানবজাতির সমান ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের চেষ্টা করে এবং বিবর্ণ ও রক্তহীন দেহের কোনো একটি বিশেষ অঙ্গের অতিরিক্ত পুষ্টিকে ঘৃণা করে। এজন্যেই কলেমার অনুসারীরা নিজেদের সমাজে জীবনযাত্রার একটা সাধারণ মান বজায় রেখেছিলেন। এতেই রয়েছে তাঁদের সহজ ও সরল জীবনযাত্রার ব্যাখ্যা। কলেমা বস্তুগত সম্পদের প্রতি উদাসীন নয়; এর উপকারিতা ও অপকারিতা দুই-ই তার সঠিকভাবে জানা। তাই, কলেমা বস্তুগত সম্পদের উপকারী গুণগুলোর সদ্ব্যবহার করে এবং অপকারী দোষগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলে। সম্পদের অপকারী বৈশিষ্ট্যের কারণেই রাসুলুল- াহ (সা.) বলেছিলেন, **'আমার দারিদ্র্যই আমার গৌরব'**। খিলাফতের জাঁকজমক প্রদর্শনের জন্যে মুসলমান আরবদের কোনো রাজপ্রাসাদ, বিশেষ পোশাক পরিহিত ভৃত্য, পারস্য দেশীয় মূল্যবান কার্পেট বা দেয়ালে অঙ্কিত চিত্রের প্রয়োজন ছিলো না। জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসন এবং বিরাট বিরাট রাজপ্রাসাদে ভর্তি দেশ থেকে যখন পর্যটক, কূটনীতিবিদ বা রাজদূতেরা আসতেন এবং আরবদের খেজুর পাতার ছাউনি দেয়া নিচু কুড়েঘরে বসতেন তখন তারা তাদের মেজবানদের বিশাল ব্যক্তিত্বের কাছে নিজেদের অত্যন্ত ছোট মনে করতেন এবং তাদের সিংহাসন ও রাজপ্রাসাদের সকল গর্ব তাদের কাছে অর্থহীন মনে হতো এজন্যে যে, তাদের শাসকশ্রেণীর জীবনধারণের মানের সঙ্গে সাধারণ জনগণের জীবনব্যবস্থার মানের কোনো তুলনাই করা যেতো না। শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি দিয়ে নয় বরং খলিফা ও তাঁর সহকর্মীদের চরিত্রের মহত্ব দিয়েই রাষ্ট্রের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষিত হতো। এটাই হচ্ছে ইসলাম আর এই হচ্ছে কলেমার আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি।

নৈতিক সংস্কৃতি

যেসব নিয়ম দ্বারা প্রকৃতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয় যেহেতু সে সবের জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে কলেমার আইন ও নৈতিকতা তাই কলেমার আইন ও নৈতিকতা একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অখ ভাবে বিশ্বাসীদের মনে স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যবোধ জাগ্রত করে। কলেমা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নৈতিকতাকে স্বীকার করে না কিন্তু সব সময়ই উঁচু স্তরের সর্বজনীন ভালোমন্দ বোধের উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে। প্রাথমিক যুগের মুসলিম আরব সমাজের দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যে কলেমার অতি উন্নত স্বাভাবিক নৈতিকতা দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা কখনো কোনো অন্যায় বা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সহ্য করতেন না। 'যে পর্যন্ত না সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করে সে পর্যন্ত সে সর্বাপেক্ষা দুর্বল, আর যে পর্যন্ত না সর্বাপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তির ন্যায্য অধিকার সংরক্ষিত হয় সে পর্যন্ত সে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী'–এটাই ছিল তৎকালীন মুসলিম আরবদের একে অন্যের সঙ্গে পারস্পরিক লেনদেন ও দৈনন্দিন কাজকর্মের আদর্শ। যদি কোনো দুর্বল মুহূর্তে তাঁরা কোনো অপরাধ করে ফেলতেন তবে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁরা অপরাধ স্বীকার করতেন এবং নিজেদের পবিত্র করার জন্যে নিজ আগ্রহে বিচারকের সিদ্ধান্ত অনুসারে শাস্তি গ্রহণ করতেন। অসৎ কাজতো দূরের কথা, যে সব চিন্তা ও কাজ মানুষের মনে অসৎ কাজ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে এবং নানারকম অসৎ কাজের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেগুলো তাদের র চিবির দ্ধ ছিলো। এজন্যেই শিল্প ও সংস্কৃতির নামে কোনোদিনই মদ্যপান, জুয়াখেলা, কুৎসিত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ নৃত্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলাকে তারা প্রশ্রয় দেন নি, কারণ মানুষের চরিত্রের ওপর এগুলোর মারাত্মক প্রভাব পড়ে এবং এগুলো মানুষকে নানারকম সমাজবিরোধী কাজের দিকে এগিয়ে দেয়।

স্ত্রীজাতিকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার যে প্রথা বর্তমানে প্রচলিত আছে তা হলো বাইজেন্টাইন ও ইরানের অভিজাত শ্রেণীর সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত দামেস্ক ও বাগদাদের সাম্রাজ্যবাদী আরব ও ইরানি এবং রাজপুত সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত মুঘল ও পাঠানদের সৃষ্টি। মুসলিম আরব সমাজে স্ত্রীলোকেরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেন এবং পুর ষদের জীবনের সমান অংশীদার হিসেবে দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের শালীনতা কঠোরভাবে রক্ষা করতেন এবং নিজেদের শোভা ও সৌন্দর্য কখনো সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতেন না। যেসব নিয়ম দ্বারা নারী ও পুর ষের মধ্যে সামাজিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো সে সব নিয়মকানুন নারী ও পুর ষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য হতো। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের প্রাসঙ্গিত আয়াত হচ্ছে—**'হে বিশ্ববাসীগণ! তোমরা নিজদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না-করে প্রবেশ করো না। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। যদি তোমরা গৃহে কাউকেও না পাও তাহলে উহাতে প্রবেশ করবে না যতোক্ষণ না তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদের বলা হয় 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে; ইহাই তোমাদের জন্যে উত্তম এবং তোমরা যা করো**

সে বিষয়ে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভালোভাবেই জানেন' (২৪:২৭-২৮)। পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে—**'আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুর ুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুর ুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক, তাদের ব্যতীত কারো নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না-করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো (২৪: ৩০-৩১)**। চিন্ড়া ও কর্মে তারা সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন এবং তারা কখনো জালিয়াতি বা ভ ামি করতেন না। নিজের প্রতিশ্র ুতি তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তাঁদের হাতে সকলের জীবন, সম্পদ ও সম্মান সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলো কেননা তাঁরা জানতেন যে, মানুষের প্রতি কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না-করে আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি কর্তব্য পালন করতে যাওয়া প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি

'শহীদের রক্তের চেয়ে জ্ঞানীর কলমের কালি বেশি মূল্যবান'—হজরত মুহম্মদ (সা.) এর এই অমূল্য বাণী আরবদের দৈনন্দিন জীবনে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁরা জ্ঞানচর্চাকে সর্বাধিক গুর ুত্ব দিতেন এবং জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ প্রদান করতেন। তাঁরা অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছিলেন। তাঁরা একে অন্যের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে জ্ঞান বিনিময় করতেন এবং সর্বদা জ্ঞান আহরণ এবং জ্ঞান বিতরণের জন্যে প্রস্ড়ুত থাকতেন। যেসব যুদ্ধবন্দি লেখাপড়া জানতেন তাদের এই শর্তে মুক্তি দেয়া হতো যে, তারা কিছু সংখ্যক নিরক্ষর মুসলমানকে লেখাপড়া শেখাবেন। তাঁরা তাদের শিক্ষকদিগকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করতেন এবং এটাই ছিলো মহানবীর শিক্ষা। কথিত আছে যে, কুকুরের সাবালকত্বের লক্ষণ একজন মুচির কাছ থেকে শিখেছিলেন বলে যুগশ্রেষ্ঠ ফেকাবিদ ঈমামে আজম হজরত আবু হানিফা (র.) নিজের আসন থেকে দাঁড়িয়ে সেই মুচিকে শিক্ষক হিসেবে সম্মান দেখিয়েছিলেন। অন্য লোকের জ্ঞান ও পাি ত্য সম্পর্কে তাদের যেমন কোনো বিরূপ ধারণা ছিলো না তেমনই নিজেদের জ্ঞানের জন্য কোনো অহংকার ছিলো না। বিবেক ও আলোচনার স্বাধীনতাকে তারা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করতেন এবং অপরের ভিন্নমতের প্রতি কখনো অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতেন না। যেসব চিন্ড়াবিদ ও দার্শনিক তাদের জীবনদর্শনের সঙ্গে একমত হতে পারতেন না তাঁদের 'হেমলক' বিষ প্রয়োগে হত্যা করার কথা তাঁরা চিন্ড়াও করতেন না। অন্য জাতির

ললিত কলা, বিজ্ঞান, আইন ও রীতিনীতি জানার জন্যে তাঁরা দেশ-দেশান্ড়র ভ্রমণ করতেন এবং প্রচারকের মনোভাব নিয়ে তাদের শিক্ষা দিতেন সদ্যলব্ধ পবিত্র কুরআনের জ্ঞান। যেহেতু তাঁরা 'ওহি' বা প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী ছিলেন তাই তাঁরা সমান গুর ুত্ব দিয়ে বুদ্ধি ও স্বজ্ঞার চর্চা করতেন। একজন চিরঞ্জিব স্রষ্টার অস্ড়িত্বে তাঁদের সক্রিয় বিশ্বাস ছিলো এবং বিশ্বাসের পবিত্রতা নিয়ে তাঁরা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন করতেন। দৈনিক পাঁচবার তাঁরা আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে মাথা নত করে নামাজ আদায় করতেন এবং রমজান মাসে নির্ধারিত সময় পর্যন্ড় উপবাস থেকে রোজা পালন করতেন, এটা সবার জন্যেই ছিলো বাধ্যতামূলক। সারাদিন পরিশ্রমের পরও গভীর রাত পর্যন্ড় জেগে থেকে রাত্রির নির্জনতায় ধ্যান ও প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁরা তাদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উৎকর্ষ সাধন করতেন। অথচ পৃথিবীর মানুষ তখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন থাকতেন।

সামাজিক সংস্কৃতি

মুসলমান আরবদের সংস্কৃতির মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ড় দেখা যায় মানবজাতির অতীত বা বর্তমান ইতিহাসে আর কোথাও তা দেখা যায় না। মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব তাঁদের কাছে একটা গুর ুত্বহীন নীতি বা মূল্যহীন আদর্শমাত্র ছিলো না বরং এটা ছিলো তাঁদের প্রত্যক্ষ সমাজজীবনের বুনিয়াদ। তাঁরা একে অন্যের শুধু সহচরই ছিলেন না বরং তাঁরা ছিলেন একে অন্যের ভাই। সমাজের মঙ্গলের জন্যে তাঁরা নিজ-নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতেন এবং শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে তাঁরা উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। কোনো পরিশ্রমের কাজ তা যতো নগণ্যই হোক না কেন, তাকে তাঁরা হীন বা নিচ বলে মনে করতেন না। জীবিকার ভিত্তিতে এক ভাইকে অন্য ভাই থেকে পৃথক করা হতো না। হজরত মুহম্মদ (সা.) প্রায়ই নিজের জুতা নিজে মেরামত করতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন এবং নিজের জামা নিজে তৈরি করতেন। একজন ইহুদির ঋণ শোধ করার জন্য সামান্য অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে হজরত মুহম্মদ (সা.) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একবার গভীর কূপ থেকে পানি উঠানোর কাজ করেছেন। হজরত আবু বকর (রা.) প্রায়ই কাপড়ের ভারি বোঝা পিঠে নিয়ে তা বিক্রি করার জন্যে মদিনার রাস্ড়া দিয়ে হেঁটে যেতেন—এ কাজকে তিনি লজ্জাজনক বলে মনে করতেন না। তাঁদের সমাজে ঈর্ষা এবং ঘৃণা, যা মানুষে মানুষে এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদ সৃষ্টি করে, তা একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কোনো ধরনের শোষণের সম্পর্ক ছিল না, এ সম্পর্ক ছিলো ভালোবাসা ও স্নেহের এবং সেজন্যে তাঁরা একে অন্যকে আপন ভাইয়ের মতো সাহায্য করতেন। পাপকে তারা ঘৃণা করতেন, কিন্ড়ু পাপীকে নয়। প্রতিহিংসার মনোভাব নিয়ে কখনো কাউকে আঘাত করতেন না, যদিওবা কখনো কাউকে আঘাত করতেন তাহলে তা করতেন প্রতিহিংসা বর্জিত কর্তব্যবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে। মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে তাদের ধারণা এতোই প্রখর ছিলো যে, তাঁরা খলিফা ও

ক্রীতদাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য বোধ করতেন না। খলিফা উমর (রা.) যখন বিজয়ের গৌরবে বিজিত শহর জের—জালেমে প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁর পরিশ্রান্ড় ক্রীতদাস উটের পিঠে আরামে বসেছিলো আর খলিফা নিজে উটের রশি ধরে উটকে টেনে নিচ্ছিলেন। একদিন গভীর রাতে খলিফা উমর (রা.) এবং রাসুল (সা.) এর চাচা (পরবর্তীকালের বাগদাদের সুলতানদের পূর্বপুর—ষ) হজরত আব্বাস (রা.) একজন ক্ষুধার্ত মহিলা এবং তার সন্ড়ানদের জন্য খাদ্য দ্রব্যের ভারি বোঝা নিজেদের কাঁধে করে পাহাড় বেঁয়ে উপরে উঠে পৌঁছে দিয়েছিলেন। খেলাফতের কাজে নিয়োজিত ক্লান্ড় ভৃত্যদের গভীর রাতে জাগিয়ে এ কাজের জন্য কষ্ট দিতে চান নি বলেই তাঁরা এমন আচরণ করেছিলেন। ধনী ও দরিদ্র, শাদা ও কালো মানুষের জন্যে তাদের পৃথক পৃথক মসজিদ ছিলো না। প্রত্যেক মানুষই সমান এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভাই সে হিসেবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁরা নামাজে দাঁড়াতেন এবং এক আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সামনে মাথা নত করতেন। একমাত্র আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার তাঁরা উপাসনা করতেন এবং একমাত্র তাঁর কাছেই তাঁরা সাহায্য চাইতেন।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি

কলেমার রাজনৈতিক বিধিবিধান, মতবাদ ও আদর্শের দ্বারাই রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো। তাঁরা মানুষের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতেন না। তাঁদের কাছে খলিফা ছিলেন তাঁদের নিজেদের মতোই আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একজন ভৃত্যস্বরূপ। তবে জনগণের সঙ্গে খলিফার পার্থক্য ছিলো এটুকু যে, পদাধিকার বলে খলিফা তাঁর পদের সঙ্গে সংশি- ষ্ট বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালনের অধিকার লাভ করতেন। আইনের শাসন কঠোরভাবে মেনে চলা হতো; জনস্বার্থের অজুহাত দিয়ে কিংবা রাষ্ট্রের মর্যাদা ও নিরাপত্তার নামে খলিফা বা রাষ্ট্রের কার্যে নিয়োজিত অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আইনের শাসন থেকে রেহাই পেতেন না। এক সময় খলিফা উমর (রা.) এর আদেশের প্রতি অসন্ড়ুষ্ট এক সাধারণ নাগরিক বিচারকের নিকট আবেদন পেশ করলে বিচারকের নির্দেশে খলিফাকে সাধারণ আসামির ন্যায় আদালতে হাজির হতে হয়েছিলো। নেশাগ্রস্ড় অবস্থায় নামাজের জামাতে ইমামতি করতে দাঁড়িয়েছিলেন এই অভিযোগ প্রমাণিত হলে খলিফা হজরত উসমান (রা.) এর নির্দেশে কুফার শাসনকর্তাকে মদিনায় ডেকে এনে মদ্যপানের নির্দিষ্ট শাস্ড়িস্বরূপ চলি- শ ঘা চাবুক মারা হয়েছিলো। সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মানের চেয়ে খিলাফতের শাসকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পারবে না—খলিফার এই নির্দেশ অমান্য করে নিজের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন বলে হজরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালীন সময়ে সিরিয়ার শাসনকর্তাকে সাধারণ রাখালের মতো মদিনায় বেশ কিছুদিন মেষ চরাতে হয়েছিলো। রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকার জনগণ সংরক্ষণ করতেন। তাই খলিফা বা খিলাফতের দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের অসন্ড়োষে ভীত না-

হয়ে তারা শাসনকার্যের সমালোচনা করতে পারতেন। কে বন্ধু বা কে শত্র— একথা ভেবে খলিফা বা খিলাফতের উচ্চপদের শাসনকর্তারা কখনো মাথা ঘামাতেন না বা উদ্বিগ্ন হতেন না। পক্ষান্ড়রে তাঁদের দৈনন্দিন কার্যকলাপ জনসাধারণের এমন সতর্ক দৃষ্টির সামনে থাকতো যে সামান্যতম অনিয়মও ফাঁকি দেয়া যেতো না বলে অসংশোধিত থাকতো না। যুদ্ধ ও শান্ড়ির বিধিবিধান কঠোরভাবে পালিত হতো। কখনো তাঁরা কোনো আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করেন নি। সশস্ত্র আক্রমণের বির—দ্ধে যখন তারা শক্তি প্রয়োগে বাধ্য হতেন তখনও বলপ্রয়োগের তীব্রতা ও স্থায়িত্ব যাতে সীমা লঙ্ঘন না-করে তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। যুদ্ধ কিংবা শান্ড়ি কোনো অবস্থায়ই অস্ত্রধারণের আসল উদ্দেশ্যকে কলুষিত করে প্রতিশোধ গ্রহণের মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতেন না। রাসুলুল- াহ (সা.) এর কাছে যখন মক্কা নগরীর পতন ঘটল তখন সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলো। মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা মক্কার দুশমনদের বির—দ্ধে তাঁদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ভুলে গেলেন; শত্র—দের তাঁরা ভাইয়ের মতো আলিঙ্গন করলেন, এর একমাত্র কারণ ছিলো এই যে, তারা শান্ড়ির প্রস্ড়াব পেশ করেছিলো। এক্ষেত্রে মুসলমানেরা এই ভেবে সুখ অনুভব করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের নিজেদের কর্তব্য ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

অর্থনৈতিক সংস্কৃতি

মুসলমানেরা নিজেদের দখলিকৃত কোনো জিনিসের ওপরই শর্তহীন অবাধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন নি কেননা তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার। তাঁদের অধিকারভুক্ত বস্ড়ুগত সম্পদ তাঁরা সংযতভাবে ততোক্ষণই ব্যবহার করতেন যতোক্ষণ পর্যন্ড় না তাঁদের থেকে অধিক অভাবগ্রস্ড় অন্য কেউ নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে সেই সম্পদের আবশ্যকতা অনুভব করতেন। যখনই কোনো অভাবগ্রস্ড় ভাই তাঁদের কাছে কিছু প্রার্থনা করতেন বা কাউকে তাঁরা অভাবগ্রস্ড় দেখতেন তখনই তাঁরা তাঁদের সমুদয় সম্পদ সেই অভাবগ্রস্ড় ভাইয়ের ব্যবহারের জন্য প্রদান করতেন। কেউ এই দান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাঁরা ব্যথিত হতেন এবং অপমান বোধ করতেন। তাঁরা দানকে ধনীর বিলাসিতা বলে গণ্য করতেন না। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক অভাবগ্রস্ড় ভাই তাঁদের সম্পদের এক একজন সত্যিকারের অংশীদার কেননা সম্পদের একমাত্র মালিক আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য তারা প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে সমবেত হতেন এবং আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সামনে নামাজে দাঁড়ানোর আগে তাঁরা অত্যন্ড় যত্নের সঙ্গে তাঁদের প্রতিবেশিদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। শুধু তাই নয় অভাবগ্রস্ড় ভাইদের চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করতেন। তাঁরা জানতেন যে, আল- াহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলার প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালন অর্থহীন ও উপহাসের শামিল হবে এবং আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট তাঁদের উপাসনা অগ্রাহ্য হবে যতোক্ষণ পর্যন্ড় না তাঁরা তাঁদের প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করবেন। তাঁরা আরো জানতেন যে, নিজ সম্পদের ওপর সমাজের দাবি অগ্রগণ্য, তাই জনসাধারণের কাজে যখন অর্থের প্রয়োজন দেখা দিতো তখন তাঁরা স্বেচ্ছায় তাঁদের সম্পদ সমাজের কাছে অর্পণ করতেন। সিরিয়ার সীমান্ড়ে তাবুকের যুদ্ধের জন্য অর্থ ও উপকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে শ্রদ্ধেয় হজরত আবু বকর (রা.) তাঁর যাবতীয় ধনসম্পদ এনে হজরত মুহম্মদ (সা.) এর সামনে পেশ করেছিলেন। সে সময় প্রত্যেক মুসলমানের ঘরেই কলেমার অর্থনীতির বিশ্বজনীনতার নিয়মকানুন কঠোরভাবে পালিত হতো। অতিথি, ভৃত্য, সন্ড়ান, স্ত্রী, পুত্র এবং পরিবারের অন্যান্য আশ্রিতদের চাহিদা পূরণের পূর্বে গৃহকর্তা নিজ প্রয়োজন মেটাতেন না। অন্যদের ক্ষুধা মেটানোর জন্যে হজরত মুহম্মদ (সা.) এবং তাঁর (সা.) বিশ্বস্ড় সাহাবিগণ (সহচর) দিনের পর দিন সানন্দে উপবাস থাকতেন। যতোক্ষণ পর্যন্ড় কোনো একজনের অধিকারে সামান্য পরিমাণ সম্পদও থাকতো ততোক্ষণ পর্যন্ড় একই আল- াহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বান্দা হিসেবে কোনো অভাবগ্রস্ড় ভাইবোন সেই সামান্য সম্পদের অংশ থেকে বঞ্চিত হতো না–যেমন একই পিতার সন্ড়ানেরা পিতার সাধারণ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয় না। প্রায়ই অতিথি কিংবা অন্যলোকের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে হজরত আলী (রা.)র ছোট ছোট সন্ড় ানদেরকেও উপোস করতে হতো। ধনসম্পদ তাঁদের অধিকারে থাকতো ঠিকই কিন্ড়ু তাঁরা ধনসম্পদের বশীভূত হতেন না। অলসতা ও কর্মবিমুখতাকে তাঁরা ঘৃণা করতেন কেননা তাঁরা জানতেন যে, বস্ড়ুগত সম্পদ অন্যান্য সকলের সঙ্গে নিজেদের ভোগদখলে রেখে ব্যবহারের অধিকার তাঁদের কাজ করা ও বেঁচে থাকার অধিকার থেকেই উৎপন্ন। যে মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্র এই সমষ্টিগত অর্থনৈতিক জীবনব্যবস্থার সংস্কৃতিকে গড়ে তোলার জন্যে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে চেষ্টা না করে, সে সমাজ বা রাষ্ট্র কিছুতেই নিজেকে মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্র বলে দাবি করতে পারে না।

পূর্ণাঙ্গ মানব

কলেমার দর্শন হচ্ছে একতা, সমন্বয় এবং ভারসাম্যের দর্শন। তাই কলেমার সংস্কৃতি জীবনের অনেকগুলো দিককে উপেক্ষা করে কোনো বিশেষ এক বা একাধিক দিকের অতিরিক্ত উন্নয়নকে অনুমোদন না-করে জীবনের সবদিকের সমন্বয়পূর্ণ ও সুষম উন্নয়নের প্রতি বিশেষ জোর দেয়। কোনো কোনো জীবনদর্শন মানুষের অর্থনৈতিক সংগ্রামের দ্বারা জীবনকে ব্যাখ্যা করে, কোনো কোনোটি যৌন প্রবৃত্তি বা শক্তিকে ইতিহাসের ব্যাখ্যায় ব্যবহার করে আবার মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির জন্য কোনো কোনোটি বস্ড়ুগত জগতের সুখ ও আনন্দকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার নীতি প্রচার করে। কিন্ড়ু এর

দুঃখজনক ফল এই দাঁড়ায় যে, অন্যান্য অনেক জীবনদর্শনের মতো এগুলোও পূর্ণাঙ্গ মানব তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। যেহেতু জীবন হচ্ছে মানুষের যাবতীয় ক্ষমতার সমষ্টিগত বিকাশ তাই এই সমষ্টির যেকোনো একটি দিয়েই হয়তো মানুষকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কিন্ড়ু এরূপ ব্যাখ্যা পূর্ণ মানুষকে ব্যাখ্যা করে না বরং মানুষ ও তার জীবনের আংশিক ও অসম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে। এ বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ সচেতন থেকে মুসলমান আরবেরা তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে কলেমার শিক্ষাকে সমানভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতেন। এভাবেই কলেমার সংস্কৃতি বর্বর মর ি-সন্ড়ানদের নিয়ে সৃষ্টি করেছিলো আদর্শ পূর্ণ মানুষের এক সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর জীবন্ড় সমাজ।